রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

"বসুমতী"র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক
লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

ছয় আনা

বিজ্ঞপ্তি

নীতিপরিবেশের মধ্যে লেখা এ বইয়ের গল্পগুলি শিশু-সাহিত্যে অঞ্জলি দিলাম। শিশু-মহলে ইহার আদর হইলে সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

আর আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি,—কল্যাণীয় শ্রীমান নারায়ণচন্দ্র ভদ্রকে—যার সম্পাদনা ও সহায়তায় বইখানির সৌষ্ঠব সাধন হইয়াছে। ইতি—

৬ই আশ্বিন, মহালয়া, ১৩৪৫ সাল।

অনুক্রম

উপহার

গ্রন্থকার প্রণীত

নীতিগল্পগুচ্ছ

ছেলেমেয়েদের আদরের বই। পারস্য কবি সেখ সাদির "গুলুস্তাঁর" কয়েকটি নীতিমূলক গল্পের সাজি। রংবেরঙের ছবিতে ভরা। সর্ব্বজন প্রশংসিত। চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য ছয় আনা।

গল্পবীথি

কয়েকটি সরস গল্পের মধ্য দিয়ে শিশুমনের কল্পনাকে অব্যাহত রাখা হয়েছে। ২য় সংস্করণ, দাম ছয় আনা।

জাতকের গল্পমঞ্জুষা

গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মকথার কয়েকটি ভাল ভাল নীতিমূলক গল্পেরচয়নিকা। দাম ছয় আনা।

শিশু-সারথি

যে জিনিস দেখা যায় না, অথচ যার অস্তিত্ব মেনে লওয়া হয়, তার কথা গল্পচ্ছলে বলা হয়েছে। দাম ছয় আনা।

বৎস, আমি বক, আমিই তোমার ভাতাদের মারিয়াছি

—"ধর্ম্মবকের প্রশ্ন"

কপালের লিখন

এক ছিল ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী। তারা বড় গরীব। মাত্র কয়েক ঘরে পুরোহিতগিরি করিয়া কোন রকমে দিন কাটিত। ব্রাহ্মণী ইহাতে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। তাই ব্রাহ্মণী দিন-রাত ব্রাহ্মণকে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও ভর্ৎসনা করিত। সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণ এতই তিক্ত হইয়া উঠিত যে, তাহার সংসার ছাড়িয়া পলাইতে ইচ্ছা হইত। ব্রাহ্মণী তাহাকে বলিত,—তুমি বড় কুড়ে, ক-ঘর যজমান থাকলেই কি দিন চলে,—গায়ে দু-একখানা গয়না পরতে কি আমার সখ হয় না। ঐ ও-পাড়ার শিরোমণির গিন্নিকে দেখ দিকি, তার গায়ে কত গয়না, আর,—

ব্রাহ্মণ বাধা দিয়ে বলে,—ব্রাহ্মণী, সবই কপালের লিখন। কপালে থাকলে তোমারও একদিন হবে।

ব্রাহ্মণী এ সান্ত্বনায় ভুলে না। তার তিরস্কার বাড়িয়াই উঠে। শেষে একদিন ব্রাহ্মণ সত্য-সত্যই বাহির হইল, বনের মধ্যে বাঘ ভালুকের হাতে প্রাণ দিতে।

বনের মধ্য দিয়া সে চলিল, কিন্তু বাঘ-ভালুকের দেখা নাই। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পথ আর চলিতে পারে না। বেলা শেষ হইল। ধীরে অন্ধকার ঘন হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মৃত্যুপণ করিয়া, সেই বনের মধ্যে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। দুঃখময় জীবনের এক একটি ঘটনা তাহার চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। তার জীবনের প্রত্যেকটি কাজ সে খুঁটিয়া বিচার করিল। কই জীবনে সে কাহারও মঙ্গল চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা করে নাই; সুব্রাহ্মণ হইতে হইলে যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ও বিধি-ব্যবস্থা ব্রাহ্মণের করণীয়, সে সবই করিয়া থাকে। তবে ভগবান্ তার জীবনে সুখ দেয় নাই কেন?—চিরজীবন অভাব অনটনে এবং দুঃখে দুঃখেই বা কাটিয়াছে কেন? তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

এদিকে কৈলাসে পার্ব্বতীর মন টলিল। সত্যই ত সদাচারী ব্রাহ্মণের এত দুঃখ কেন? তিনি শিবকে বলিলেন,—দেখ, ঐ ব্রাহ্মণের এত কষ্ট কেন? সৎ-ব্রাহ্মণের কষ্ট দূর করা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?

শিব বলিলেন,—পার্ব্বতী, কপালের লিখন! হাজার ধন-দৌলত দিলেও ওর এখন দুঃখ ঘুচবে না।

পার্ব্বতী বলিলেন,—তুমি কি ধন-দৌলত দিয়ে দেখেছ? একবার দিয়েই দেখ। আমার মনে হয় নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণী ধন-দৌলত পেলে, ব্রাহ্মণকে আর উত্যক্ত করবে না, আর সে ধন-দৌলত নষ্টও হবে না।

শিব বলিলেন,—বেশ তোমার কথায় একবার পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্।

তখন শিব, এক অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিলেন। যষ্টিহস্তে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রাহ্মণ, তোমার কি হ'য়েছে, তুমি কাঁদছ কেন?

এ নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে সহসা মানুষের গলার স্বর শুনিয়া ব্রাহ্মণ চমকিত ও

বিস্মিত হইল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া, বৃদ্ধের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল,—মশায়, দেখ্‌ছি আপনি অতি বৃদ্ধ. আমারই মত আপনিও কি সংসারের জ্বালায় প্রাণত্যাগ করতে বনে এসেছেন ?

আমারই মত আপনিও কি সংসারের জ্বালায়

ব্রাহ্মণবেশী শিব বলিলেন,—হাঁ, বন্ধু, আপনার মত আমিও দুঃখী। দুঃখকষ্টের জ্বালায় আমি নদীতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলাম. এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী এসে আমায় আত্মহত্যা করতে বারণ করলেন। তিনি দুটি থলে দিয়ে বললেন, একটি থলে তুমি নাও, আর একটি থলে এই বনে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখতে পাবে, তাকে দিও। সেই জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি একটি থলে আপনাকে দিতে।

ব্রাহ্মণ বলিল,—থলে আমার কি হবে ?

শিব বলিলেন,—দেখ, এই থলেটি উপুড় ক'রে নাড়লেই, এর মধ্যে থেকে উৎকৃষ্ট মনোহরা সন্দেশ টপ্ টপ্ ক'রে পড়তে থাকবে। তুমি ঐ সন্দেশ বাজারে বিক্রয় ক'রে, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবে।

কথাগুলি বলিয়াই শিব অদৃশ্য হইলেন।

ব্রাহ্মণ, শিব-প্রদত্ত থলি পাইয়া, আনন্দে আত্মহারা হইল, এবং থলির প্রকৃতই ঐরূপ গুণ আছে কি না তাহা পরীক্ষার জন্য, ঐ অরণ্য মধ্যেই থলেটি উপুড় করিয়া নাড়া দিল। নাড়া দিবামাত্রই গুটিকতক বড় বড় মনোহরা সন্দেশ থলে হইতে টপ্ টপ্ করিয়া পড়িল। এই সন্দেশ হইতেই অর্থ, এবং এই অর্থের দ্বারা ব্রাহ্মণীকে তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহাদের সকল কষ্ট দূর হইবে ভাবিয়া, ভারি আনন্দ হইল।

এদিকে প্রাতে ব্রাহ্মণ গৃহ ত্যাগ করিলে, ব্রাহ্মণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে ব্রাহ্মণী স্বামীকে না দেখিয়া, বাড়ির চারিদিকে অন্বেষণ করিল। কিন্তু কোথাও যখন স্বামীর সাক্ষাৎ মিলিল না, তখন প্রমাদ গণিল।

সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়া চক্ষের পাতা ফুলিয়াছে। ভোর রাত্রে সেই বেগ যখন প্রবল আকারে ব্রাহ্মণীকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে, সেই সময়ে দ্বারে টোকা মারার শব্দ হইল,—সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর স্বর ব্রাহ্মণীর কর্ণে গেল, শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণী দ্বার খুলিয়া দিল। কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে কোন কথা হইল না। পরে ব্রাহ্মণ নিজেই কথা কহিল, বলিল,—ভগবান্ আমাদের দুঃখ ঘুচিয়েছেন, খাবার ভাবনা আর আমাদের ভাবতে হবে না। গিন্নি, তোমার গয়না পরার সখও মিটবে।

এই বলিয়া থলেটি ব্রাহ্মণীকে দেখাইল।

একে ব্রাহ্মণীর সমস্ত দিন ও রাত্রি ভাবনায় ও অনাহারে কাটিয়াছে, সে সময়ে স্বামী প্রদত্ত শূন্য থলেটি দেখিয়া, তামাসা মনে করিয়া ব্রাহ্মণীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল,—পদাহত ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,—তোমার লজ্জা করে না! কাল থেকে দাঁতে দাঁত দিয়ে প'ড়ে আছি, জলস্পর্শ করি নি! কোত্থেকে গিলে-কুটে-এসে ঢঙ করতে এসেছ! যাও! যেখানে ছিলে সেখানেই যাও!

ব্রাহ্মণ তখন ব্রাহ্মণীকে খুশি করিবার জন্য, একটা শূন্য পাত্রে থলেটি উপুড় করিয়া ধরিয়া নাড়া দিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই শূন্য পাত্রটি সন্দেশে পূর্ণ হইয়া গেল। চক্ষের সম্মুখে এই ভৌতিক কাণ্ড দেখিয়া ব্রাহ্মণীর প্রথমে ভয়, পরে মুখে হাসি দেখা দিল। এতক্ষণে যে মুখ বর্ষার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, মেঘ সরিয়া গেল, আবার রৌদ্র দেখা দিল।

নিত্য রাশি রাশি সন্দেশ বিক্রয় করিয়া, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সুখের সীমা রহিল না। বেশ আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল।

সন্দেশ, থলে হইতে টপ্ টপ্ করিয়া

এদিকে রাজা থলের অদ্ভুত গুণের কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণের নিকট হইতে উহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেন। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইল। নিত্য নিত্য ভর্ৎসনা ও গঞ্জনায় ব্রাহ্মণ পুনরায় অতিষ্ঠ হইল, এবং দারুণ ক্ষোভে, দুঃখে প্রাণত্যাগ করিবার বাসনায় অরণ্য মধ্যে আবার প্রবেশ করিল।

সে রাত্রে হর-পার্ব্বতী সেই বনভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। শিব পার্ব্বতীকে বলিলেন,—ঐ যে ব্রাহ্মণ চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে ও সেই

দিনের ব্রাহ্মণ। ওর কপালের লিখন এমনি, এখন হাজার ধন-দৌলত দিলেও বেশি দিন ভোগ করতে পাবে না।

পার্ব্বতী বলিলেন,—ব্রাহ্মণের ত দোষ নেই। সে ধনী হ'য়েও দেখ কেমন নিষ্ঠার সহিত দিন যাপন করে; অথচ রাজা তার কাছ থেকেই থলে কেড়ে নিল এর কারণ কি? ব্রাহ্মণ নির্দ্দোষ বলেই কি তার এত কষ্ট! এখন তুমি এর একটা বিধি ব্যবস্থা না ক'রলে গরীব মারা যাবে।

এবারে শিব সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া এমন একটা থলে দিলেন, যে থলে উপুড় ক'রে নাড়লে মোহর পড়ে।

রাজা লোক পরম্পরায় থলের গুণের কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণের নিকট হইতে থলে সমেত যথা সর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক লইয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ আবার ব্রাহ্মণীর গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া, বনের মধ্যে বাঘ ভালুকের মুখে প্রাণ দিতে আসিল। এবারেও হর-পার্ব্বতীর নজরে পড়িল; শিব রাজার ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া কাপালিক বেশে ব্রাহ্মণের সমীপে উপস্থিত হইলেন, একটা থলে দিয়া বলিলেন,—দেখ, সাবধানে এই থলে উপুড় ক'রে নাড়বে। কেননা এই থলের ভিতর আমার পোষা দুইটি ভূত দিলাম। তবে তোমায় একটি সঙ্কেত ব'লে দিচ্ছি, বেশ মনে রাখবে। এই থলে উপুড় ক'রে নাড়লেই দুই ভূত বেরিয়ে যাকে সামনে পাবে তাকেই কিল চড় মেরে আধমরা করবে। সে সময়ে তুমি ভয় পেয়ো না,—মনে মনে 'শিব শিব' বললেই ও-দুটো থলের মধ্যে ঢুকে যাবে। তুমি বাড়িতে গিয়ে প্রচার করবে যে, এবার এমন থলে এনেছি, যা উপুড় ক'রে নাড়লে মণি-মুক্তা ঝরতে থাকবে। তার পর সেই কথা রাজার কানে গেলে বুঝেছ ত,—

ব্রাহ্মণ আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিল,—বুঝেছি ঠাকুর, আর বলতে হবে না।

ব্রাহ্মণ বাড়িতে ফিরিয়া গিয়া প্রচার করিল যে, সে এবার এমন একটা থলে পাইয়াছে, যাহা উপুড় করিয়া নাড়িলে মণি-মুক্তা ঝরিতে থাকিবে।

রাজা এই সংবাদ লোক মুখে পাইয়া, ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সেই থলি কাড়িয়া লইয়া গেলেন, এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিজ গৃহে থলেটি উপুড় করিয়া নাড়িলেন। অমনি উহার মধ্য হইতে দুই বিকটাকার ভূত নির্গত হইয়া রাজাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিল। চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিল, কেহই ভূতের সঙ্গে পারিয়া উঠিল না। শেষে রাণী ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া, পূর্ব্বেকার থলি-গুলি দিয়া তাহাকে তুষ্ট করিলেন। ব্রাহ্মণ মনে মনে 'শিব শিব' বলিবামাত্র এই দুই ভূত থলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাণী থলেগুলি দিয়া

রাজার চেতন হইলে, নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন সেই অবধি রাজা ও ব্রাহ্মণে খুব মিল হইল।

কৈলাসে শিব পার্ব্বতীকে বলিলেন—কপালের লিখনই মানুষের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করে। আমার ও তোমার শত চেষ্টাতেও তার অন্যথা হবে না।

এক গুরুঠাকুর শিষ্যবাড়ি যাবার মনস্থ করেছেন, কিন্তু তল্পিধারীর অভাবে যেতে পারছেন না। গুরুঠাকুরের অনেক গুণ, দোষের মধ্যে কৃপণ, তল্পিধারীর প্রাপ্য সব টাকা দেন না। তাই কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে চায় না। অনেক কষ্টে একটা লোক পেলেন সে জাতিতে পরামাণিক।

পরামাণিক সঙ্গে যেতে রাজি হ'য়ে বললে,—দেখ দা-ঠাকুর, আমি কিছু পাই না পাই তাতে কিছু এসে যাবে না, কিন্তু যদি আমার চোখে কোন অদ্ভুত কিছু ঠেকে এবং তার বিবরণ জানতে চাই, সেই দণ্ডেই আমাকে তার ইতিহাস বলতে হবে, যদি না বল দা-ঠাকুর আমি তল্পি-তল্পা ফেলে বাড়ি ফিরব।

পরামাণিকের চুক্তির কথা শুনে গুরুঠাকুর কিছুক্ষণ ধরে ভাবলেন, লোকটা মিনি পয়সায় যেতে চাচ্ছে যখন, তখন একে ছাড়া হবে না। বললেন,—আচ্ছা তাই হবে,—চল।

গুরুঠাকুর পরামাণিককে সঙ্গে নিয়ে, ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে বেরিয়ে পড়লেন। গ্রীষ্মকাল রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। সেই গরমে মেঠো রাস্তা পার হ'তে

ন্য আব্দার ধরে, তাই সেটা চাপা দেবার ছলে বললেন,—এখন রোদ্দুরের থাক্‌তাত, একটু বোস্‌ জিরো। আমি এইখানেই মুখ, হাত, পা ধোয়া চলেছেব।

এক যজমর ছাড়বার পাত্র নয়, বলে উঠল,—মুখ, হাত, পা ধোবেন কি দা-ঠাকুর? সমাদরে বসতে কড়ার হ'য়েছিল তা কি ভুলে গেছেন? তা হ'বে না। ঐ আছে

গুরুঠাকুর ভৌতিক কাণ্ড কি কান

আছে কি? কোথা থেকে

যজমান হাত বাড়িয়ে আঙুল দেখিয়ে বললেন,—ঐ যে পুকুর দেখা যাচ্ছে, একটু গেলেই দেখতে পাবেন।

গুরুঠাকুর তখন তল্পিদার পরামাণিককে বললেন,—দেখ্‌ নফর, ঐ থেকে, আমার এই গাড়ুতে ক'রে এক গাড়ু জল ও গামছাখানা বেশ ক'রে কেচে নিয়ে আয় ত?

গুরুঠাকুরের আদেশমত নফর গাড়ু ও গামছা নিয়ে পুকুরপাড়ে ছুটল, একটু পরেই শুকনো গাড়ু ও গামছা গুরুঠাকুরের পায়ের কাছে রেখে দিল।

শুকনো গাড়ু-গামছা দেখে গুরুঠাকুর বললেন,—ফিরে এলি যে, পুকুর দেখতে পাস্‌নি বুঝি?

নফর বেশ সরলভাবে বললে,—পুকুর পাব না কেন?

গুরুঠাকুর রেগে বললেন,—তবে রে পাজি! ফিরে এলি যে?

নফর বললে,—নিজের ইচ্ছেয় ফিরে আসেনি দা-ঠাকুর, ফিরিয়ে দেছে

গুরুঠাকুর তখন যজমানের মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—ও পুকুরে কি সকলের নামবার বারণ আছে?

যজমান আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন,—বারণ নাই ত? নফরের মিছে কথা?

ৰ্দী

ম সুরে

ণ করেছে ?

নফর ... বলেনি বটে, কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত ... ক ফিরে আসতে বাধ্য করেছে।

যজমান কি ভেবে বললেন,—ওঃ ! নফর, তুমি ঠিকই বলেছ। অদ্ভুত কি বলছ, অতি অদ্ভুত ! যেন ভৌতিক কাণ্ড ব'লে মনে হয় !

গুরুঠাকুর এতক্ষণ উভয়ের কথোপকথন শুনছিলেন। পুকুর-পাড়ে কি একটা অদ্ভুত ভৌতিক কাণ্ডের কথা শুনে, গুরুঠাকুরের টনক নড়ল, নফরের কথা মনে পড়ল,—প্রবাসে আসবার সময় নফর যে কড়ারে তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল, সব কথা মনে পড়ল, বললেন,—তোমরা অদ্ভুত কাণ্ড, ভৌতিক কাণ্ড বলছ, সেটা কি ? সত্যিই কি পুকুর-পাড়ে কিছু অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছ না কি ?

যজমান বললেন,—হাঁ গুরুঠাকুর, সত্যিই একটা অদ্ভুত দৃশ্য আমরা ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি। সেই সঙ্গে নফরও হাত-মুখ নেড়ে ব'লে উঠল,—আশ্চর্য্য দা-ঠাকুর ! ভারি আশ্চর্য্য ! কত জোর বাতাস বইছে, সেই জোর বাতাসে, পুকুর-পাড়ের খোলা জায়গায় একটি পিদিম ঠায় জ্বলছে, শিখাটা ঠিক সমান উঁচু হ'য়ে আছে, দুলছেও না, নড়ছেও না ! আশ্চর্য্য কাণ্ড দা-ঠাকুর !

নফরের মুখে অদ্ভুত দৃশ্যের কথা শুনেই গুরুঠাকুর ঠিক ভেবে নিলেন, নফর এই জন্যে জল আনে নি। পাছে এই অসময়ে নফর, ঐ প্রদীপের ইতিহাস জানিবার

জন্যে আব্দার ধরে, তাই সেটা চাপা দেবার ছলে বললেন,—এখন রোদ্দুরের বড় তাত, একটু বোস্ জিরো। আমি এইখানেই মুখ, হাত, পা ধোয়া সেরে নেব

নফর ছাড়বার পাত্র নয়, বলে উঠল,—মুখ, হাত, পা ধোবেন কি দা-ঠাকুর? আমার সঙ্গে কি কড়ার হ'য়েছিল তা কি ভুলে গেছেন? তা হ'বে না। ঐ অদ্ভুত ভৌতিক কাণ্ড কি ক'রে হ'ল, কোথা থেকে ঘটল, সে সব কথা না বললে আমি কিছুতেই ছাড়ছি নি,—বলতে হবে।

সব কথা না বললে আমি

গুরুঠাকুর মহা ফাঁপরে পড়লেন, বললেন,—তোর কি ক্ষিধে-তেষ্টা কিছু নেই, এই পড়ন্ত রোদ্দুর, চারদিক জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'চ্ছে, গাছের পাখি-গুলো গরমে ঝোঁপের ভেতর ঢুকে আছে, এ সময়ে আব্দার জুড়লে কি হয় রে নফর! এখন একটু জিরো, খাওয়া দাওয়া সেরে নে, তারপর বলব'খণ।

নফর কিন্তু সে কথায় ভুলল না, বললে,—দা-ঠাকুর, আপনি যাই বলুন, নফর ও ছেঁদো-কথায় ভুলবে না,—যে কথা সেই কাজ। এই আপনার তল্পি-তল্পা রইল, নফর সব রেখে বাড়ি চলল।

আচ্ছা নফর আচ্ছা, তোমার কথাই রইল,—ঐ পিদিমের ইতিহাস যে অতি অদ্ভুত তা'তে সন্দেহ নাই, তবে বলি মন দিয়ে শোন্।

যজমান, ছেলেবেলা থেকে দশ বছরের ওপর, ঐ পিদিমটাকে জ্বলতে দেখে আসছে, কিন্তু কেন জ্বলছে, কি কারণে জ্বলছে, কেই বা জ্বেলে রেখে গেছে, তার কোন খবরই জানেন না, এমন কি সেখানকার অনেক বুড়ো লোককে জিজ্ঞেস ক'রেও কোন উত্তর পান নি। এত দিন কৌতূহলে কৌতূহলেই চলে গেছে, আজ গুরুঠাকুরের মুখে সেই রহস্য-ভেদ হবে জেনে, ঐ বিবরণ জানবার জন্যে, তাঁর ঐ কৌতূহল দ্বিগুণ বেড়ে উঠল, বললেন,—গুরুঠাকুর,—ঐ পিদিমের রহস্য জানবার জন্যে সকলেই ব্যস্ত। অতএব আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি যত শীঘ্র পারি লোকজন ডেকে নিয়ে আসি, তারপর সব ব্যবস্থা ঠিক হ'লে আপনি বলবেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বেদী প্রস্তুত হ'ল। বাড়ির সামনে অনেকটা খোলা জমি পড়ে ছিল, সেই জমিতে সামিয়ানা টাঙিয়ে সকলের বসবার আসন হ'ল তখন গুরুঠাকুর বেদিতে বসে গল্প আরম্ভ করলেন।

এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী। সন্তানাদি না হওয়ায় বড়ই দুঃখ। নিত্য ভগবানের কাছে জানায়,—হে ভগবান, আমাদের একটি পুত্র-সন্তান দাও ঠাকুর! কিন্তু এমনই দুর্ভাগা, এত ডেকেও পুত্র হ'ল না,—কত ঠাকুরের দোর ধরলে, সাধু-বৈষ্ণব ভোজন করালে, পুত্র হ'ল না,—নিরানন্দে দিন কাটতে লাগল। একদিন এক সাধু-সন্ন্যাসী দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে উপস্থিত। ব্রাহ্মণী চাল, পয়সা সন্ন্যাসীকে দিতে গেল। সন্ন্যাসী হাত তুলে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন,—মঙ্গল হোক, মনের আনন্দে সংসার-ধর্ম্ম কর।

সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদে, আনন্দের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণীর চোখে জল দেখা দিল,

ছল-ছল নয়নে বললে,—দেখ সন্ন্যাসী-ঠাকুর, আমাদের মনে একটুও সুখ নেই,—তোমার আশীর্ব্বাদ যেন ফলে ঠাকুর !

সন্ন্যাসী বললেন,—কিসের এত দুঃখ ?

ব্রাহ্মণী চোখের জল মুছে বললে,—এই বৃহৎ সংসারে একটিও ছেলে নাই,—বড় দুঃখে আছি।

সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণীর হাতের রেখা দেখে বললেন,—অদৃষ্টে ছেলে আছে, তবে,—

অদৃষ্টে ছেলে আছে শুনে ব্রাহ্মণী স্বর্গ যেন হাতে পেলে। সন্ন্যাসীর কথা শেষ হ'তে না হ'তে বললে,—ঠিক কিনা বলনা ঠাকুর ! আমার ছেলে কি হবে ঠাকুর ?

সেই সময়ে ব্রাহ্মণও এসে পড়ল। স্বামীকে উদ্দেশ ক'রে ব্রাহ্মণী বললে,—শুনছ,—সন্ন্যাসী-ঠাকুর কি বলছে ?

সন্ন্যাসী-ঠাকুর কি বলছেন ?

ব্রাহ্মণী স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললে,—সন্ন্যাসী-ঠাকুর বলছে,—আমার বরাতে ছেলে আছে।

ব্রাহ্মণ কৌতূহলী হ'য়ে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাইল। সন্ন্যাসী তখন বুঝলেন, ছেলের কথা সত্যি কি না, ব্রাহ্মণ আমার মুখে শুনতে চায়, বললেন,—হাঁ, সত্যই তোমাদের বরাতে পুত্র-সন্তান আছে। তবে সে পুত্র তোমাদের সুখের কারণ না হয়ে দুঃখই দেবে।

পুত্র জন্মাবে অথচ দুঃখ দেবে, এর অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে, পরিষ্কার ক'রে বুঝে নেবার জন্যে ব্রাহ্মণ বললে,—এ কথার মানে কি, ঠাকুর কিছুই বুঝলাম না,—ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন।

সন্ন্যাসী বললেন,—মানে এই যে, পুত্রটি জন্মে ষোল বছর অবধি বেঁচে থাকবে, ষোল বছর পূর্ণ হ'লেই ভবলীলা সাঙ্গ করবে।

ব্রাহ্মণ চমকে উঠে বললে—অমন ছেলে চাইনে ঠাকুর! কোলে পিঠে মানুষ ক'রে, অত বড় ছেলে, অতুল পাথারে ভাসিয়ে, বুক ভেঙে চলে যাবে, অমন ছেলে চাই নে!

ব্রাহ্মণী আর থাকতে পারলে না, বললে,—তা হোক্, তবু ত ষোল বছর চোখের সামনে ছেলেকে দেখতে পাব।

এই ব'লে ব্রাহ্মণী ছেলের জন্যে জিদ ধ'রে বসল। স্বামীর কোন কথাই তার কানে প্রবেশ করল না। তখন ব্রাহ্মণ স্ত্রীর মতে মত দিয়ে সন্ন্যাসীকে ঔষধ দিতে বললে।

সন্ন্যাসী ঔষধ দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে চলে গেলেন।

ব্রাহ্মণী সন্ন্যাসীর কথামত যথা নিয়মে ঔষধ সেবন করল। দশ মাস দশ দিনে ব্রাহ্মণী রাজপুত্রের মত একটি সুন্দর পুত্র প্রসব করলে। ব্রাহ্মণ-দম্পতির আনন্দের পরিসীমা রইল না। পুত্রটি শশীকলার ন্যায় দিন দিন বাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী পুত্রের নামকরণ করলে রঘু। দেখতে দেখতে রঘু ছ' বছরে পড়ল। ব্রাহ্মণ রঘুকে পাঠশালায় ভর্ত্তি ক'রে দিল। তার লেখা পড়া কিছু হ'ল না, পড়ায় মন বসল না, রাত-দিন খেলিয়ে বেড়ায়। বাপ তাকে পীড়ন করতে যায়, মা বারণ করে, বলে,—ওকে কিছু ব'ল না, ওর পরমায়ু কতটুকু! যে কটা দিন বেঁচে থাকে, এতেই আমাদের সুখ।

সেইদিন থেকে ব্রাহ্মণ রঘুকে মার-ধর, বকা-বকি সব ছেড়ে দিল। রঘু সাপের পাঁচ পা দেখল, ডানপিটেগিরি ধরল। কাকেও মারে, কাকেও ধরে, এই রকম দস্যিবৃত্তি করতে লাগল। লোকের নালিশ শুনতে শুনতে ব্রাহ্মণের কান ঝালা-ফালা হ'য়ে গেল। অনেক লোকের গালাগালিও খেতে লাগল। ব্রাহ্মণীর কথা ভেবে সবই সহ্য করতে লাগল।

এই রকমে দুরন্তপনা করতে করতে রঘুর বয়স যখন ষোল বছর পূর্ণ হ'তে একদিন মাত্র বাকি, সেই দিন সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হচ্ছিল,—ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলছিল,—দেখ ব্রাহ্মণী, সেই সময় বলেছিলাম, অমন ছেলে, যে ছেলে ষোল বছর বয়স যেতেই বুক ভেঙে চলে যাবে, অমন ছেলেতে কাজ নাই। তুমিই ছেলে ছেলে ক'রে যত কিছু বিপদ ঘটালে। আজ দেখ দেখি, কি দুঃখ না হচ্ছে! বলে কেঁদে ফেললে।

ব্রাহ্মণী তখন অতি কষ্টে চোখের জল নিবারণ ক'রে বলতে লাগল,— আমাদের তখনকার মনের ভাব তুমি সবই জান! ছেলের জন্যে আমরা কি রকম পাগল হ'য়েছিলাম তা সবই জান! পুত্রস্নেহ যে কি, তা জানতাম না, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি! আজ সেই ছেলে পূর্ণ ষোল বছর হ'তে একদিন মাত্র বাকি! এই রাত পোয়াতেই এমন সোনার চাঁদ ছেলে, আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে ভগবান্! তোমার মনে কি এই ছিল! ব'লে ব্রাহ্মণী মূর্চ্ছাগত হল।

তুমি কাদের ছেলে গা?

যে সময়ে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হ'তেছিল, সেই সময় রঘু

বাইরে কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল। শুনে সে স্থির করলে, আজ যদি এ বাড়িতে থাকি, তা হ'লে কাল সকালে আমার মৃত্যু নিশ্চয় ঘটবে। যে মা-বাপ আমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন, একবার চোখের আড়াল হ'তে দেন না, সেই মা-বাপের যে কি দুঃখ, কি কষ্ট হবে তা বলবার নয়। এর চেয়ে যদি আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, অন্যত্র যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তা' হলে মা-বাপে আমার মরণের শোকে কখনই কাতর হবেন না। সামনে মরা ও চোখের আড়ালে মরা এ দুয়ে অনেক তফাৎ। আমার এখানে থাকা হবে না। বলেই রঘু চম্পট দিল।

পুত্র রঘু যে, ওদের দুজনের সব কথা শুনেছে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কিছুই জানল না। রঘু ছুটতে ছুটতে এক মাঠে পড়ল। দেখল সম্মুখে এক বরযাত্রীর দল বরকে চোতুর্দ্দোলায় বসিয়ে চলেছে। বরের চেহারা এত কদাকার যে, তাকে সুন্দর সাজে সাজালেও ঠিক মনে হচ্ছে, যেন একটা বানরকে সাজ-সজ্জা দিয়ে সাজিয়ে বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে।

রঘু বর দেখতে পথের ধারে থমকে দাঁড়াল। এমন সময় একজন হোমরা-চোমরা বুড়ো রঘুকে ময়লা কাপড় পরে দাঁড়াতে দেখে, তার কাছে এসে বললেন,—তুমি কাদের ছেলে গা?

রঘু কি ভেবে হেসে বললে,—আমি দুনিয়ার ছেলে।

রঘুর হেঁয়ালি-কথা শুনে রঘুর প্রতি বুড়োর, কেমন একটা ভালবাসা জন্মে গেল, স্নেহস্বরে বললেন,—তোমার বাড়ী কোথায়?

আকাশের তলে।

তোমার কে আছে?

ভগবান।

বেশ বেশ ছোকরা, তোমার কথাগুলো বেশ মিষ্টি, আর দেখতেও ঠিক রাজপুত্তুরের মত। তোমায় ছাড়ছিনি বাবা, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

কোথায় ?

বিয়ে বাড়ি।

আপনি কে যে, আপনার কথায় যাব।

আমি বরকর্ত্তা, আমারই ছেলের বিয়ে।

আচ্ছা মশাই ঠিক ক'রে বলুন দেখি, কন্যাকর্ত্তা আপনার ছেলেকে দেখে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ক'রেছে, না,—এর ভেতর কিছু কারচুপি আছে ?

বাঃ ! বেশ বুদ্ধিমান ছেলে ত তুমি। তুমি ত ঠিক ধরেছ ?

দেখুন মশাই, একটা কথা বলি রাগ করবেন না। মেয়ের বাপ, এ ছেলেকে দেখলে, কখনই মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

তাই ত তোমায় পাকড়েছি।

আমি কি করতে পারি।

অন্য ছেলেকে দেখিয়ে যেমন আমার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছি, তেমনি তোমায় বর সাজিয়ে বিয়ের কার্য্যটা শেষ করব।

রঘু খুব এক চোট হেসে নিয়ে বললে,—বিয়ের পর কণে কার হবে ?

আমার ছেলের হ'য়ে যখন বিয়ে করছ, তখন আমার ছেলের বৌ হবে।

আমি যদি না দি।

তোমারই থাকবে। তোমায় আমি ছেলের মতন বাড়ীতে রেখে দেব। তুমি ঐ বৌ নিয়ে ঘর-কন্না করবে।

আমি যদি আপনার বাড়ীতে থাকতে রাজি না হই ?

তখন বুড়োর চোখে জল এল, এক রকম কেঁদেই ফেললেন, বললেন,—

তোমার গলায় পৈতে দেখে বুঝেছি তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, আমিও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের উপকার না করে, তবে ব্রাহ্মণ যায় কোথা। তুমি এ যাত্রা আমায় রক্ষা কর!

রঘু মনে মনে বললে,—জীবনের শেষে যদি ব্রাহ্মণের উপকার ক'রে যেতে পারি, তার চেয়ে পুণ্য আর কি আছে? রঘু সম্মত হল।

তখনি সেই মাঠের মাঝেই বরকে নামিয়ে বরের পোষাক খুলে নিয়ে রঘুকে সেই পোষাক পরাণ হ'ল,—মনে হ'ল যেন চাঁদ খসে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। ঢাক, ঢোল, কাড়া-নাগরা ও বরযাত্রীর দল যে যেখানে ছিল, সকলেই মহানন্দে কণের বাড়ি অভিমুখে ছুটল। কণের বাড়ির সামনে রঘু এসে পড়তেই কণের বাপ খুব খুসী হ'য়ে বরকে কোলে ক'রে বিবাহ সভায় বসিয়ে দিলেন। সকলে বরের সুন্দর মূর্ত্তি দেখে শতমুখে প্রশংসা জুড়ে দিলেন।

যথালগ্নে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল। বর ও কণে বাসর ঘরে উপস্থিত হ'ল। নিশুথি রাত্রে যখন সকলে ঘুমে অচেতন, তখন বর কণেকে বললে,—দেখ, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'ল বটে, আমি তোমার বর নই।

কণে চমকে উঠে বললে,—তবে কে আমার বর?

তোমার যে আসল বর, তাকে রাত দুটোয় এখানে রেখে যাবে, আমার সঙ্গে এই রকম কথা হ'য়েছে।

কণের চোখে জল এল, কাঁদ কাঁদ সুরে বললে,—তোমার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হ'য়েছে, তখন তোমা বই আর কাকেও আমি চিনি নি। তুমিই আমার স্বামী আর কেউ নয়।

রঘু বললে,—দেখ আমার আশা ছেড়ে দাও। আমি এ কাজে কেন মত দিয়েছি জান, পরের উপকার করতে। আর আমার পরমায়ু কতটুকু জান, রাত্রি

প্রভাত পর্য্যন্ত, তার পরেই আমার মৃত্যু ঘটবে। এ মড়াকে নিয়ে তোমার সুখ কি? তার চেয়ে, যা বলি তা শোন, তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে সুখে ঘর-কন্না কর।

সে কথায় কণে কান দিল না। রঘু অনেক ক'রে বোঝালে তবু কণে যখন সে কথা শুনল না, তখন রঘু একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্ত্রপূত ক'রে বললে,—এই জ্বলন্ত প্রদীপ তুমি একটা পুকুর-পাড়ে রেখে আসবে। আমি বেঁচে থাকতে, জল, ঝড়, বজ্রাঘাতেও এ প্রদীপ নিববে না, এমন কি শিখা দুলবে না। ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কণে, রঘুর কথামত প্রদীপটি ঐ পুকুর-পাড়ে রেখে দিয়ে গেছে। কত বৎসর কেটে গেছে, প্রদীপ সেই একইভাবে জ্বলছে। রঘু এখনও বেঁচে আছে, বাপ মাকে নিয়ে ঐ স্ত্রীর সঙ্গে সুখে ঘর-কন্না করছে।

গুরুঠাকুর এই পর্য্যন্ত ব'লে নফরের দিকে মুখ ক'রে বললেন,—নফর, শুনলি ত? নফরের মুখে আর হাসি ধরে না, বললে,—পেন্নাম হই দা-ঠাকুর—ধন্যি ধন্যি!

বড় বিদ্যে

এক রাজা পাত্র, মিত্র ও সভাসদ্‌বর্গ নিয়ে রাজতক্তে উপবিষ্ট। কথায় কথায় কথা উঠল, বিদ্যার মধ্যে কোন্ বিদ্যা বড়। এক মন্ত্রী বললেন,—চুরি বিদ্যা বড়।

রাজা ঘৃণায় মুখ বাঁকালেন, বললেন,—মন্ত্রী, তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়েছে?

মন্ত্রী বললেন,—কেন মহারাজ?

মুখভঙ্গী ক'রে রাজা বললেন,—যে বিদ্যার অপেক্ষা জঘন্য বিদ্যা আর নাই, সেই বিদ্যাকে আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ বলছেন?

মন্ত্রী দৃঢ়স্বরে বললেন,—একশবার বলব।

বটে, মুখের কথা শুনতে চাই নে, চাক্ষুষ দেখাতে পারবেন?

পারি মহারাজ।

যদি হেরে যান, মুণ্ডচ্ছেদ ক'রব।

তাই স্বীকার মহারাজ।

যখন-তখন চুরি হবে না, ব'লে ক'য়ে চুরি করতে হবে। রাজি আছেন ?

হাঁ, রাজি মহারাজ।

আচ্ছা, ছ মাস সময় দিলাম, এর মধ্যে পরীক্ষা শেষ করতে হবে।

আমি কিছুতেই পেছপাও নই মহারাজ।

সেই দিন হ'তে মন্ত্রী ছদ্মবেশে এক পাকা চোরের সন্ধান করতে লাগলেন। এ পাড়া, সে পাড়া, এ গলি, সে গলি, ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একদিন দেখলেন, একজন লোক একটা বড় বাড়ির ছাদের ওপরে কোটালকে দেখে থমকে দাঁড়াল,—ছাদের দিকে মুখ ক'রে অপদার্থ ব'লে গালি দিল। তারপর ওকে পাই ত এই করি ব'লে, মাথার পাগড়ি থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে চলে গেল।

মন্ত্রী সমস্ত ব্যাপারটা দেখলেন, লোকটার নিকট গিয়ে, আলাপ পরিচয় ক'রে বুঝলেন লোকটি গুণী ও নির্ভিক। বললেন,—তোমার কাণ্ড সব দেখেছি, শুনেছি।

কি দেখেছেন, কি শুনেছেন ?

সব কথা ও মাথার পাগড়ি ছেঁড়া।

কি বুঝলেন ?

কিছু-মিছু।

লোকটি হেসে বললে,—তবে ত আপনি একজন খুব বুঝদার লোক।

পূরো নয়, কতক মতক।

তা নয় পূরো দস্তুর।

কেন বল দেখি ?

এক আঁচড়েই বুঝে নিয়েছি।

যা ব'লেছ, সব বিদ্যেই কিছু কিছু বুঝা আছে, চুরি বিদ্যেটা কেবল বাকি। তেমন পাকা চোরের দেখা পাই ত কিছু শিখে নি।

এই ত চোর সামনে দাঁড়িয়ে, শিখতে চান ত বলুন।

শিখব পরে। উপস্থিত যে দায়ে পড়েছি, সে দায় থেকে উদ্ধার হ'লে বাঁচি।

কি দায় ?

প্রাণের দায়।

কেন ?

চুরি বিদ্যেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যে ব'লেছি ব'লে।

উচিত কথাই বলেছেন।

যদি উচিত কথাই ব'লে থাকি, তবে প্রাণের দায় থেকে বাঁচাও দেখি।

নিশ্চয়ই বাঁচাব, তবে কথাটা কি শুনি ?

কথাটা এই যে, সামনের অমাবস্যা রাত্রে রাজার শয়ন ঘরে, বিছানার ওপর কড়িকাঠে একখানা জলে-ভর্ত্তি থালা সিকেয় ঝুলবে, সেই থালাখানা চুরি করতে হবে।

খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে

যদি চুরি যায়, কি মিলবে ?

রাজা, হাজার টাকা বক্‌সিস্ করবেন

যদি না পারে।

আমার গর্দ্দান যাবে।

আপনার গর্দ্দান যাবে কেন ?

রাজসভায় কোন্ বিদ্যা বড় কথা উঠতে, আমিই কেবল বলি,—সকল বিদ্যার সেরা, চুরি বিদ্যা। তাই রাজা চটে গিয়ে গর্দ্দান নেবেন বলেছেন,—পরীক্ষায় সফল হ'লে বিপুল পুরস্কার।

আপনি যখন রাজসভার কথা বলছেন, তখন বেশ জানছি আপনি একজন সামান্য লোক নন,—কেউ কেটা হবেন।

আমি রাজার সামান্য একজন মন্ত্রী মাত্র।

আজ যে ঘটনাচক্রে আপনার সহিত, খোলাখুলি ভাবে আলাপ-পরিচয় হ'ল, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি এত বড় একজন দেশের মন্ত্রী হ'য়ে, আমার প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করেছেন, তা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়।

আমিও তোমার ভাব-ভক্তির কথা ও পাগড়ি ছেঁড়া ব্যাপারে, তোমায় বিশেষ ক'রে বুঝে নিয়েছি।

কি বুঝেছেন ?

বুঝেছি এই যে, ঐ কোটালের ওপর তুমি এত চটা যে, লোকটা চোরের সন্ধান না জেনে কোটালগিরি করতে যায় ব'লে, আসল চোর ধরা পড়ে না, তাই রাগে তোমার সর্ব্বাঙ্গ গস্ গস্ করতে থাকে। একবার পাও ত নেকড়ার মতন টুকরো টুকরো ক'রে ফেল, সত্যি নয় কি ?

ঠিক কথা মন্ত্রী মশাই, ওর ওপর আমার রাগ ঐরূপই বটে।

মন্ত্রী তখন সাহস পেয়ে বললেন,—এ ক্ষেত্রে তুমিই উপযুক্ত লোক। আমিও তোমায় ঐ চুরির ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

তথাস্তু ব'লে লোকটা মন্ত্রীর নিকট বিদায় নিয়ে, অন্য পথে চলে গেল।

রাত প্রায় বারটা। একটা লোক রাজার বাগানের পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে বারটা বড় বড় পেরেক ও হাতুড়ি। অল্পক্ষণ পরেই রাজবাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারটা বাজতে সুরু করলে। লোকটা ঘড়ির ঘায়ের সঙ্গে সঙ্গে হাতের পেরেক পাঁচিলের গায়ে মারতে মারতে প্রথমে পাঁচিলে, তার পরে রাজার শোবার ঘরের ছাদে উঠে গেল। ক্রমে রাত দুটো বাজল।

রাণী রাজাকে বলছেন,—রাত দুটো বেজে গেল, এখনও চোরের ভয় করছ, আর চোর আসবে না।

রাজা উত্তরে বললেন,—একটু জেগে থাকতেই বা দোষ কি?

তা তুমি জাগগে, আমি আর পেরে উঠছি না, চোখ জড়িয়ে আসছে।

এই ব'লে রাণী চোখ বুজলেন। রাজাও খানিকক্ষণ বিছানার ওপর এ-পাশ ও-পাশ ক'রে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনটা বাজল। রাজা ও রাণী দুজনেই ঘুমে অচেতন। তাঁদের যখন ঐরূপ অবস্থা, তখন ছাদের ওপর ঘন ঘন কাজ চলতে লাগল। দেখতে দেখতে ছাদ ছাঁদা হ'য়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে এক রাশ ছাই থালার জলে পড়ে জলটা চুষে নিল; দেখতে দেখতে থালাখানা লোকটার হাতে এসে পড়ল; চকিতের মধ্যে লোকটা থালাখানা নিয়ে পাঁচিল ব'য়ে রাস্তায় নেমে উধাও হ'য়ে গেল।

ভোর রাত্রে রাজা ও রাণী ঘুম ভেঙে দেখলেন, মাথার ওপর সিকে ঝুলছে,—থালা নাই।

রাজবাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গেল। চাকর বাকর হ'তে সরকার গোমস্তা পর্য্যন্ত সকলের ডাক পড়ল, কেউ খোঁজ খবর দিতে পারলে না। রাজসভা যেমন নিত্য বসে,

সেদিনও বসল। সেদিন মন্ত্রী সকাল সকাল নিজের আসনে জেঁকে বসলেন। পরে অন্যান্য সকলেই হাজির হলেন। সে দিন রাজার দেখা নাই, রাজার আস্‌তেই বিলম্ব। বিলম্বে রাজা এলেন। রাজ-সিংহাসনে উপবেশন মাত্র, একটা লোক ধীরে ধীরে রাজার নিকটে এসে অভিবাদন ক'রে দাঁড়াল। মন্ত্রী তাকে দেখেই চিনে নিলেন, রাজাকে বললেন,—মহারাজ, এই যে লোকটিকে দেখছেন, এই লোকটি কাল রাত্রে আপনার থালা চুরি করেছে।

ছেলেটাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে

রাজা হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে বললেন,—তুমি আমার থালা চুরি করেছ ?

লোকটি করযোড়ে অতি বিনয় ক'রে বললে,—হাঁ মহারাজ! এই আপনার থালা।

কাপড়ের ভেতর থেকে থালাখানা বার ক'রে সভামধ্যে রাখল।

রাজা চোরের খুব প্রশংসা ক'রে বললেন,—দেখ, তোমার হাত খুব সাফাই, এবারে হাজার টাকা পুরস্কার দিলাম। তবে এবারে যা বলব তা যদি পার দু হাজার টাকা বক্‌শিস্ মিলবে। যদি ধরা পড়, শাস্তির একশেষ হবে। রাজি আছ ?

শাস্তির কথা শুনে যেন কিছুই নয়, এই ভাবে লোকটা বললে,—আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা বললেন,—দেখ, এই সামনের পূর্ণিমা রাত্রে, আমার শোবার ঘরের বিছানার চাদর চুরি করতে হবে।

লোকটি অভিবাদন ক'রে চলে গেল।

পূর্ণিমা রাত্রি! রাজবাড়ির নিকটে এক রাস্তায় একদল মুসলমান একটা ছোট ছেলের মড়া নিয়ে চলেছে। খানিক দূর গিয়ে তারা সেই মড়াটাকে গোর দিয়ে যে যেখানে চলে গেল। খানিক পরে, একটা লোক সেই গোর খুঁড়ে ছেলেটাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে সরে পড়ল।

রাত্রি দেড়টা। রাজা ও রাণী তখনও জেগে বসে আছেন। সঙ্গে পিস্তল। চোরের দেখা পেলেই গুলি করবেন। আকাশটা বড়ই গোলমেলে, টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ছে, এক একবার চিকুর ভাঙছে। বিদ্যুৎ চমকাবার মাঝে হঠাৎ রাজা-রাণীর জানলার দিকে নজর পড়ল। দেখলেন, কে যেন একটা লোক তেতালা ব'য়ে তাঁর ঘরের জানলায় উঁকি মারছে। রাণী ভয়ে জড়সড় হ'য়ে রাজাকে বললেন,—গতিক ভাল নয়। যে লোক তিনতলা ব'য়ে চুরি করতে আসে সে বড় সহজ চোর নয়।

রাজা বললেন,—ঠিকই বলেছ রাণী, বিষম ধড়িবাজ চোর। আজ চোরকে একেবারে সাবড়াবই সাবড়াব।

কথা শেষ হ'তে না হ'তেই রাজা-রাণী দুজনেই জানলায় আবার মূর্ত্তি দেখতে পেলেন। যেমন দেখা অমনি পিস্তল ছোঁড়া, অমনি লাগা, অমনি পড়া। রাণী ভয়ে চমকে উঠে বললেন,—আহা! মেরে ফেললে?

তাই ত, করলাম কি! দেখিগে চল!

চল চল ! শিগ্‌গির চল ! নইলে কেউ দেখলে বড় গোল হবে !

উভয়ে তখন দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা হ'য়ে ছুটলেন। নীচে গিয়ে দেখলেন একটা মরা ছেলে বাঁশের ডগায় বাঁধা। রাজা-রাণী তখন চোরের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলেন। এদিকে চোর ঘরে ঢুকে বিছানার চাদর নিয়ে প্রস্থান।

চোরাই চাদরখানি রাজার সামনে রেখে

রাজা-রাণী ফিরে এসে দেখেন বিছানায় চাদর নাই।

পূর্ব্বের দিনের মত রাজ-সভা বসল। চোর চোরাই চাদরখানি রাজার সামনে রেখে কর-যোড়ে বললে,—মহারাজ, আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে, বড় বড চুরি অনেক করেছি একবারও ধরা পড়ি নাই। আপনি আবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন।

রাজার বিশ্বাস জন্মাল, এবং তার বুদ্ধির বিস্তর প্রশংসা ক'রে, দু' হাজার টাকা

পুরস্কৃত ক'রে বললেন,—আমার রাজ্যে তোমার মত একজন বিচক্ষণ লোক বিশেষ দরকার হ'য়েছে। চোর বাটপাড়ের জ্বালায় প্রজারা তিষ্ঠিতে পারছে না, তুমি ঠিক উপযুক্ত লোক।

এই ব'লে রাজা কোটালকে ছাড়িয়ে লোকটাকে সেই কোটালগিরি চাকরি দিয়ে দিলেন। কিছুদিন পরে রাজা যখন দেখলেন, লোকটি কাজে বাহাল হ'য়ে অবধি রাজ্যের মধ্যে চুরি, বাটপাড়ি, খুন, খারাবি সব থেমে গিয়েছে, তখন একদিন মন্ত্রীকে বললেন,—দেখুন মন্ত্রী মশায়, আপনার দ্বারা এই লোকটিকে পেয়েছি তাই, রাজ্যে চোরের ও দুষ্টের দমন হ'য়েছে, কুশল দেখা দিয়েছে। অতএব আজ হ'তে আপনাকে প্রধান মন্ত্রীত্ব-পদে নিযুক্ত করাই স্থির করলাম।

মাষ্টার। কার শক্তিতে মানুষ কাজ করে বল দেখি ?

অরুণ। দেহের বলে।

মাষ্টার। দেহের বল কি ক'রে জানলে ?

অরুণ। আমি যদি একটা ভারি জিনিস জোর ক'রে তুলি, সেটা ত আমার দেহেরই শক্তি বলতে হবে।

মাষ্টার। দেহ মানে কি বুঝেছ।

অরুণ। পা হ'তে মাথা পর্য্যন্ত এই সবটাকে দেহ বলছি।

মাষ্টার। হাত. পা, চোখ, কান, আঙুল প্রভৃতি এরাও কি দেহ ?

অরুণ। দেহের এক একটি অংশ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব'লে জানি।

মাষ্টার। ভাল। তবে একটা দ্রব্য শুধু হাত দিয়ে তুলতে সমস্ত দেহে জোর পড়ে কেন ? শুধু হাতের জোরে তোলা যায় না কেন, বলতে পার ?

অরুণ। তা জানি না।

মাষ্টার। আবার দেখ, যদি দেহের একটা অঙ্গ, যেমন হাত,—যদি প'ড়ে যায়, অকেজো হ'য়ে যায়, অথচ বাকি শরীরটা খুব সুস্থ থাকে, তাহ'লে সে সেই পঙ্গু হাত দিয়ে কোন দ্রব্য তোলা ত পরের কথা, নাড়তে পর্য্যন্ত পারে না।

অরুণ। ঠিক কথা। কাকার বাঁ হাত এমন অবশ হ'য়ে গেছে যে, সে হাতে কোন কাজই করতে পারেন না।

মাষ্টার। এখন বুঝছ, আমরা যে হাত পা খেলাচ্ছি, বা, যা কাজকর্ম্ম করছি, তা দেহের শক্তিতে নয়, অন্য শক্তির বলে নয় কি?

অরুণ। সে শক্তিটা কি, কোথা থেকে আসে মাষ্টার মশাই?

মাষ্টার কোথা থেকে আসে জান। মাথা বা মস্তিষ্কে যে মন আছে, সেই মন থেকে শক্তি আসে,—দেহ থেকে নয়। একটা মোটামুটি ধ'রে রাখ, তুমি যা কিছু করছ, যেমন হাতের কাজ, পায়ের কাজ, চলা-ফেরা, চোখে দেখা, কানে শোনা, এমন কি ভাবনা চিন্তা সবই মন থেকে। তাই মনের স্থানই হ'চ্ছে মস্তিষ্ক বা মাথা। আবার এই সঙ্গে এও শিখে রাখ যে, আমাদের দেহের ভেতরে যে দশটা ইন্দ্রিয় আছে, ঐ ইন্দ্রিয় সকলের কর্ত্তা মন, অর্থাৎ মনই এদের চালাচ্ছে। অতএব মন একটি ইন্দ্রিয়, সেইজন্য সর্ব্ব শুদ্ধ এগারটি ইন্দ্রিয় বলা হয়।

অরুণ। আমাদের রাগ-টাগ যা কিছু সবই কি মাথা থেকে আসে?

মাষ্টার। নিশ্চয়। ও-সব ত আছেই তা ছাড়া ভাল-মন্দ যা কিছু ভাবি বা করি সবেরই মূল মস্তিষ্ক।

অরুণ। মাথা থেকেই যদি সব আসে, তবে পণ্ডিতের বুদ্ধি বেশি আর মূর্খের বুদ্ধি কম হয় কেন?

মাষ্টার। পণ্ডিত হ'লেই যে, সব বিষয়ে পণ্ডিত হবে, সব বিষয়ে জানা থাকবে তা নয়। এর একটা গল্প বলি শোন,—এক মস্ত দিগ্‌গজ পণ্ডিত দিন রাত শাস্ত্র পড়তেন ও শিষ্যদের পড়াতেন; আর ব্রাহ্মণী রান্না-বান্না ও সংসারের কাজ নিয়ে থাকতেন। একদিন ব্রাহ্মণী ভাত চড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্বামীকে ঐ দেখবার ভার দিয়ে বাইরে গেছেন, এমন সময়ে ভাত ফুটে ফেন উথলে হাঁড়ির গা ব'য়ে

এত পড়তে লাগল যে, আগুন নিবে যাবার মতন হ'ল। তখন পণ্ডিত কোন উপায় ঠিক করতে না পেরে, শাস্ত্রে এর কোন বিধান আছে কি না জানবার জন্যে দেখতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও কিছু না পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী এসে উপস্থিত। এত বড় জগৎজোড়া নামের পণ্ডিতের অবস্থা দেখে ব্রাহ্মণী হাসি থামাতে পারলেন না, খুব এক চোট হেসে নিয়ে এক গণ্ডুষ জল হাঁড়িতে দিতেই সেই ফেন হাঁড়ির তলায় নেমে গেল। তাই দেখে পণ্ডিত ত অবাক। ব্রাহ্মণী নিশ্চয় যাদুমন্ত্র জানে এই ভেবে ব্রাহ্মণীকে স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। তবেই দেখ, অত বড় একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত, হাঁড়িতে ফেন উথলে পড়লে কি করতে হয় তা জানেন না। এতে ক'রে বুঝে নাও, পণ্ডিত হ'লেই যে তিনি সবজান্তা হবেন তা নয়।

শাস্ত্রে এর কোন বিধান আছে কি না।

তরুণ। পণ্ডিতেরা যদি সব বিষয় না জানবে, তবে তারা পণ্ডিত হ'ল কিসে?

মাষ্টার কেবল শাস্ত্র পড়লেই যে তিনি পণ্ডিত তা নয়, পণ্ডিত অনেক রকমের আছে

অরুণ সে কি রকম?

মাষ্টার এখন প্রথমে জানতে হবে, পণ্ডিত এই শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

পণ্ডিতের ঠিক অর্থ ধরতে গেলে,—যার যে বিষয়ে বেশি জ্ঞান বা বেশি জানা আছে, সে সেই বিষয়ে পণ্ডিত। যেমন,—যে ভাল বুনতে পারে, সে বোনায় পণ্ডিত, যে ভাল শেলাই করতে পারে, সে শেলায়ে পণ্ডিত, যে ভাল চাক ঘোরাতে পারে, সে চাক ঘোরাতে পণ্ডিত। এই ত পণ্ডিত কথার অর্থ। তাই বলি, সব বিষয়ে পণ্ডিত হ'তে হ'লে, কত যে শিখতে হয় তার শেষ নাই। তুমি ত এখন ছোট শিশু, তোমার শেখবার অনেক বাকি। ট্রেন যখন ছোটে বাইরে থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় নাকি যে, মাঠের গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, সবই যেন ছুটছে,—রেলগাড়িখানা যেন ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, যা কিছু সব যেমনকার তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, গাড়িটা জোরে ছুটছে ব'লে ঐ রকম দেখাচ্ছে, এই না?

অরুণ। এ ত সকলেই জানে, এ ত নতুন কথা নয়।

মাষ্টার। ঠিক ক'রে বল দেখি, তুমি যখন আরও ছোট ছেলে, তখন কি এ সব জানতে?

অরুণ। তা জানতাম না। বাবা ব'লে দিতে তবে জেনেছি।

মাষ্টার। ঠিক তাই। যার জানা আছে, তার পক্ষে সেটা সহজ, কিন্তু যার জানা নাই তার পক্ষে পণ্ডিত অপণ্ডিত দুই সমান। এই তোমার কথাতেই দেখ না, তুমি তোমার বাবার ও আমার কাছ থেকে আমাদের উপদেশ শুনে যেমন অনেক জটিল বিষয় শিখে ফেলেছ, তেমনি ভাল ভাল পণ্ডিত ও বিদ্বান লোকের কাছে থাকতে থাকতে আকাট মূর্খকেও এমন সব জ্ঞানলাভ করতে দেখা গিয়েছে, যাতে সে অতি বড় বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ ক'রেছে। এ সম্বন্ধে একটা গল্প বলি শোন,—

রাজবাড়িতে এক জেলে রোজ মাছ যোগাত এবং রাজসভার একপাশে দাঁড়িয়ে পণ্ডিতদের কথা-বার্ত্তা শুনত। একদিন একটা খুব বড় মাছ তার জালে

পড়ল। জেলে রাজবাড়িতে রোজ যেমন মাছ দিয়ে থাকে, সে দিনও সেই মাছ নিয়ে রাজার বাড়িতে উপস্থিত হ'ল। অতবড় মাছ রাজা-রাণী কখনও চোখে দেখেন নাই, তাই এই মাছের জোড়া দেখবার জন্যে রাজা-রাণীর বড় ইচ্ছে হ'ল। রাজা জেলেকে বললেন,—এই মাছের জোড়া তুই যদি সাত দিনের ভেতর আনতে পারিস্ তোকে অনেক পুরস্কার করব, যদি না পারিস্ বিষম শাস্তি দোব।

এই মাছের জোড়া যদি সাতদিনের ভেতর আনতে পারিস্

মাছের কথা ভাবতে ভাবতে জেলে ঘরে ফিরল। এক দিন দু' দিন ক'রে ছ' দিন কেটে গেল। নদীর নানা স্থানে, নানা মোহানায়, নানা কৌশলে জাল ফেললে, কিন্তু ও রকম বড় মাছ একটিও মিলল না। সাত দিনের দিন, সেই জেলে রোজ তারিখের মত মাছ নিয়ে রাজার

বাড়িতে উপস্থিত হ'ল। জেলেকে দেখেই রাজা জিজ্ঞেস করলেন,—সে মাছের জোড়া কৈ ?

জেলে বললে,—মহারাজ, মাছের রাজা আজ আমায় এসে বললেন,—এর জোড়া মাছটি দুঃখে আত্মহত্যা করেছে। তাই,—

রাজা ত শুনে অবাক্। মূর্খ জেলের মুখে পণ্ডিতের মত কথা শুনে বললেন,—তোকে এমন কথা কে শেখালে ?

জেলে বললে,—মহারাজ, আমায় কেহ শেখায় নাই, সঙ্গগুণে স্বর্গলাভ হয়। রাজ-সভায় পণ্ডিতদের নানা কথা-বার্ত্তা শুনে শিখেছি।

রাজা জেলের উপর খুব খুশি হ'য়ে অনেক টাকা পুরস্কার দিলেন। জেলে রাজাকে অভিবাদন ক'রে হাসি মুখে ঘরে ফিরল।
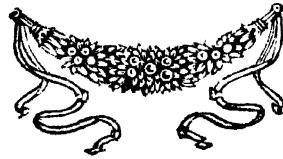
মহাভারতের কথা।

রাজা দুর্য্যোধন সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। দুর্ব্বাসা মুনি দশ হাজার শিষ্য নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হ'য়ে বললেন,—রাজন্ একাদশীর পারণ করব, তাই এসেছি।

রাজা মুনিকে নানা রকমে তুষ্ট করলেন, নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য সামগ্রী দিয়ে পরিতোষরূপে ভোজন করালেন। সেবা ও যত্নে মুনি তুষ্ট হ'য়ে বললেন,—রাজন্, তোমার সেবায় বড়ই পরিতুষ্ট হ'য়েছি,—কি বর চাও বল?

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ইতিপূর্ব্বেই কর্ণ ও দুঃশাসনের সঙ্গে এই মন্ত্রণা ক'রে রেখেছিলেন যে, দুর্ব্বাসা সন্তুষ্ট হ'য়ে বর দিতে এলেই এই বর নেওয়া হবে যে,—যেন মুনি দশ হাজার শিষ্য নিয়ে কাম্যক বনে পাণ্ডবদের কাছে দ্রৌপদীর ভোজন-শেষে গিয়ে পারণ সমাপন করেন।

উভয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা ক'রে, দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসার নিকট করযোড়ে বললেন, হে ব্রহ্মণ্! রাজা যুধিষ্ঠির আমাদিগের কুলের জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ গুণবান্ এবং ধার্ম্মিক, তিনি এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত বনে বাস করছেন। অতএব আপনি যেমন আমার নিকট সশিষ্যে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, সেইরূপ তাঁর নিকটও আতিথ্য গ্রহণ করুন। সকলের ও নিজের ভোজন শেষ হ'লে যে সময়ে দ্রৌপদী সুখে বিশ্রাম করবেন, সেই সময়ে আপনাকে সেখানে যেতে হবে। আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।

দুর্য্যোধনের মিষ্ট বাক্যে মুনি সন্তুষ্ট হ'য়ে বললেন,—বেশ, বেশ, আমি তাই করব।

তিনি সশিষ্যে প্রস্থান করলেন।

দুর্ব্বাসা প্রস্থান করলে, মহাবীর কর্ণ, আনন্দিত হ'য়ে দুর্য্যোধনকে বললেন,—হে কৌরব! সৌভাগ্যক্রমে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হ'ল। তুমি শত্রুগণকে বিনাযুদ্ধে নিপাতের ব্যবস্থা করলে। পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই দুর্ব্বাসার ক্রোধানলে ভস্ম হবে।

একাদশীর পারণের দিন আগত। মুনি দশ সহস্র শিষ্য নিয়ে কাম্যক বনে উপস্থিত হলেন। মুনিকে অবেলায় আসতে দেখে, পাণ্ডবেরা চিন্তাযুক্ত হলেন। বুঝে নিলেন, ইহার মূলে কুটিল ও কুচক্রী দুর্য্যোধন আছে। সে মুনির কাছে অপরাধী ক'রে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধনের ফন্দি খাটিয়েছে। পাণ্ডবেরা সে ভাব বাইরে না দেখিয়ে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন,—মুনিরাজ! আপনার আগমনের কারণ?

মুনি বললেন,—আমরা আজ তোমাদের এখানে একাদশীর পারণ করব, তোমরা ইহার ব্যবস্থা কর।

ধর্ম্মরাজ অতি সৌজন্য দেখিয়ে বললেন,—আপনার চরণ স্পর্শে এ স্থান পবিত্র হ'য়েছে, আমরাও ধন্য হ'য়েছি। আর বেলা নাই, পারণের সময়ও শেষ হ'য়ে আসছে। আপনারা ঐ দেব নদীতে স্নান ক'রে আসুন এবং আহারাদি ক'রে পারণ সমাপন করুন।

বেশ, বেশ, আমি তাই করব

যুধিষ্ঠিরের বাক্যে পরিতুষ্ট হ'য়ে মুনি সশিষ্য নদীতে স্নান করতে গেলেন,—তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না, কি ক'রে ধর্ম্মরাজ এত লোককে ভোজন করাবেন।

দুর্ব্বাসার পারণের সংবাদ শুনে দ্রৌপদীর ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা রইল না। ভাবলেন, আজ যদি মুনির পারণ সম্পন্ন না হয়, তবে আর রক্ষা নাই, ক্রোধী

দুর্ব্বাসা সকলকেই ভস্ম করে ফেলবেন। এই বিপদে দ্রুপদ-কুমারী বিপদভঞ্জন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণকে আকুল প্রাণে ডাকতে লাগলেন।

ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর কি স্থির থাকতে পারেন. তিনি মথুরা ছেড়ে কাম্যক বনে দ্রৌপদীর নিকট আগমন করলেন, এবং দুর্ব্বাসার আগমন ও পারণ-বার্ত্তা শুনে হেসে বললেন,—পৃথিবীতে এমন কে আছে, যে তোমাদের অনিষ্ট করে।

দ্রুপদ-কুমারী অতি কষ্টে চক্ষুজল নিবারণ ক'রে বললেন,—সত্য প্রভু! কিন্তু আজকের বিপদ বড়ই ভয়ানক! আমি নিজের প্রাণের জন্য চিন্তিত নই, কিন্তু আমার চোখের সম্মুখে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পাণ্ডবেরা যে, মুনির অভিসম্পাতে অকারণে ভস্মীভূত হবেন, এই দুঃখেই আমার অন্তর দগ্ধ হচ্ছে! রক্ষা কর প্রভু! রক্ষা কর! বলে মূর্চ্ছিত হ'লেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ ও শান্ত ক'রে বললেন,—দ্রৌপদি! আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে, আমাকে কিছু ভোজন করাও।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে অতিমাত্র লজ্জিত হ'য়ে দ্রুপদনন্দিনী বললেন,—জানেন ত দেব! আমার ভোজন পর্য্যন্ত সূর্য্যদত্ত স্থালী অন্নে পূর্ণ থাকে, কিন্তু আজ আমি ভোজন সমাপ্ত ক'রেছি, বৃথা আশা প্রভু! স্থালী একেবারে শূন্য! অবশিষ্ট কিছুই নাই! চোখের জলে দ্রৌপদীর দুই গণ্ড ভাসিয়া গেল।

এত দুঃখের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের বদনে হাসি দেখা দিল। হেসে বললেন,—দ্রৌপদি! আমি ক্ষুধায় বড় কাতর হ'য়েছি, এ সময়ে পরিহাস করা কি উচিত? শীঘ্র যাও সেই স্থালী এনে আমাকে দেখাও।

লজ্জা পেয়ে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে স্থালী উপস্থিত করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যা কখন হবার নয়, সেদিন সেই অঘটন ঘটে গেল, স্থালীর

একপাশে কিঞ্চিৎ শাক ও অন্ন দেখা গেল। শ্রীকৃষ্ণ তাই ভোজন ক'রে বললেন,—এতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হউন।

ভীমকে আদেশ করলেন,—ভীম, তুমি গিয়ে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করবার জন্য ডেকে নিয়ে এস।

শ্রীকৃষ্ণ তাই ভোজন ক'রে বললেন

এদিকে দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মুনিগণ দেব নদীতে স্নান ক'রে উঠতে যাবেন, হঠাৎ তাঁদের ক্ষুধাতৃষ্ণা কোথায় চলে গেল! তখন তাপসগণ দুর্ব্বাসাকে বলতে লাগলেন, হে মুনে! আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে আহারাদি প্রস্তুত করতে ব'লে স্নান করতে এসেছি, কিন্তু আমাদের পেট এত ভরে উঠেছে যে, আর খাবার উপায় নাই, এখন কি করি বলুন?

দুর্ব্বাসা বললেন,—তাইত কাজটা বড়ই অন্যায় হ'য়ে গেছে। এখন এ পাপের জন্য ধর্ম্মরাজ যদি রেগে যান, আমাদের পক্ষে বড়ই মন্দ হবে। পাণ্ডবদের বড় সামান্য লোক মনে ক'র না; উহাদের মত ধার্ম্মিক, ন্যায়পরায়ণ, ও

সদাচারী অতি বিরল। মনে করলে, উঁহারা আমাদের সকলকে ভস্ম ক'রে ফেলতে পারেন, চল, সকলে এখান থেকে পালাই চল! ঐ দেখ ভীম আমাদের ডাকতে আসছে,—আর এখানে থাকা নয়।

দুর্ব্বাসার ভয় হ'তেই, পালা!—পালা! রব উঠে গেল, সকলে যে' যেদিকে পারলেন পলায়ন করলেন।

ভীম ফিরে এসে তাঁদের পলায়নের সংবাদ দিলেও যুধিষ্ঠিরের ভয় গেল না। তাঁর ভয়,—যদি হঠাৎ রাত্রে দুর্ব্বাসা আবার এসে পড়েন তখন কি হবে!

এই ভেবে ধর্ম্মরাজ কাতর হ'য়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ধর্ম্মরাজকে কাতর দেখে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বললেন;—আমি এসেছি কেন জান? ক্রোধী দুর্ব্বাসা পাছে কিছু বিপদ ঘটায়, সেই ভয়ে দ্রৌপদী আমাকে ডেকেছিলেন। তাঁর ডাকেই আমি এসেছি। এখন দুর্ব্বাসা যা শিক্ষা পেয়ে গেছে, আর কস্মিন্‌কালেও এ মুখো হবেন না। যারা অধাম্মিক তাদেরই ভয় বেশি, তোমরা ধাম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ, তোমাদের সে ভয় নাই,—আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের কল্যাণ হ'ক!

দ্রৌপদী বললেন,—হে গোবিন্দ, মধুসূদন! বিপদ সাগর উত্তীর্ণ হ'তে তুমিই একমাত্র তরী। তুমি ছিলে বলেই আজ এ দারুণ সঙ্কট হ'তে রক্ষা পেলাম।

মন আর দেহের যোগাযোগ

লেখা-পড়া বা যে কোন কাজ-কর্ম্ম খুব মন দিয়ে করাকে বলে মনোযোগ। কতকগুলি রাশিকে একত্র ক'রে এক সমষ্টিতে নিয়ে আসার নামই যেমন যোগ কষা, তেমনি আমাদের মন পাঁচ কাজে ছড়িয়ে আছে,—সেই ছড়ান মনকে টেনে নিয়ে এসে একটা কাজে নিযুক্ত ক'রে রাখাকে বলে মনোযোগ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, রশ্মিজালকে আতসি কাচের সাহায্যে এক জায়গায় গুটিয়ে জড় করতে পারলে আগুনের কাজ করে, অর্থাৎ অনেক জিনিস পুড়িয়ে ফেলতে পারে—তা বোধ হয় সকলেই দেখেছ। সেই রকম ছড়ান মনকে বুদ্ধিরূপ আতসি কাচ দিয়ে গুটিয়ে নিয়ে এসে যদি কাজ-কর্ম্মে লেখা-পড়ায় ফেলা যায়, তাহ'লে তার ক্রিয়া যে অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন হয়,—তা তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছ। তাই বলি যে বালক মনোযোগ দিয়ে লেখা-পড়া শেখে, সেই ভাল লেখা-পড়া শিখতে পারে।

ছাত্র। এই বুঝেছি—সূর্য্যরশ্মি ছড়িয়ে আছে। সেই রশ্মিকে আতসি কাচ দিয়ে এক জায়গায় জড় করলে তার শক্তি, রশ্মির ছড়ান শক্তির চেয়ে অনেক

বেশি হয়, তেমনি ছড়ান মনকে বুদ্ধিরূপ আতসি কাচ দিয়ে এক সঙ্গে জড় করলে তার শক্তিও যে বাড়ে তা'তে সন্দেহ নাই।

শিক্ষক। ঠিক বলেছ, অনেক ছেলে আছে তারা খুব বেশিক্ষণ পড়ে, অথচ তাদের কিছু মনে থাকে না তাদের পড়ার অনেক ভুল হয়। তুমি বাড়িতে অনেক পড় কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতে পার না। কেন এমন হয় বল দেখি ?

ছাত্র। মনোযোগ দিয়ে না পড়াতেই এই দোষ ঘটে, এ ত বাঁধা কথা মাষ্টার মশাই।

শিক্ষক আর মনে ক'রে রাখার নামই স্মরণশক্তি। এই শক্তি বাড়ে ও কমে।

ছাত্র। কি ক'রে বাড়ে ও কমে ?

শিক্ষক বার বার মনোযোগ দিয়ে প'ড়ে অভ্যাস করতে করতে যেটা মনে গেঁথে যায়—সেটা আর ভুল হয় না। আর তা না করলেই কমে যায়।

ছাত্র। অভ্যাস মানে কি ?

শিক্ষক। বার বার পড়া ও বার বার দেখা-শুনা করাকেই অভ্যাস বলে।

ছাত্র। বার বার পড়া ও বার বার দেখা-শুনার অভ্যাসে কি হয় ?

শিক্ষক। ফল অনেক। যে বালক যত বেশি পড়ে ও দেখে, সে বালকের তত বেশি মনে ক'রে রাখবার ক্ষমতা বাড়ে। আর যে আরও মনোযোগ দিয়ে পড়া-শুনা কাজ-কর্ম্ম করে, তার স্মরণশক্তি খুব শীগগির বেড়ে যায়।

ছাত্র। যদি রাত দিন কাজ-কর্ম্ম পড়া-শুনা নিয়েই থাকব—তবে খেলা করা কি একেবারে বারণ ?

শিক্ষক। খেলতে বারণ কেন করব। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে খেলা-ধূলা,

লাফা-লাফি, ঝাঁপা-ঝাঁপি, ডন, বৈঠক ইত্যাদি। করলে তবে শরীর ভাল থাকে। তাই ছেলেদের শরীর ভাল রাখবার জন্যে স্কুলে স্কুলে আজকাল কত রকম ব্যায়ামের প্রচলন হয়েছে।

ছাত্র। ব্যায়ামের ফল কি?

শিক্ষক। ব্যায়াম মানে শরীর-চর্চ্চা—শরীরের পুষ্টি-সাধন। মনোনিবেশ বা মনোযোগ দিয়ে কাজ-কর্ম্ম লেখা-পড়া করলে যেমন মেধা বা স্মরণশক্তি বাড়ে. সেই রকম ব্যায়াম বা দেহের চর্চ্চায় শরীরের শক্তি, দেহের পুষ্টি হয়। ঐ সঙ্গে দেহও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত, কেননা দেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে মনে স্ফুর্ত্তি থাকে না—নানা রোগ এসে দেখা দেয়।

খেলা-ধূলা, লাফা-লাফি ঝাঁপা-ঝাঁপি

ছাত্র। তা হ'লে মনের যেমন পুষ্টি দরকার, দেহেরও তেমনি পুষ্টি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দরকার। তাই স্কুলে স্কুলে লেখা-পড়া, খেলা-ধূলার সঙ্গে ব্যায়াম চর্চ্চার জন্যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেছেন, না মাষ্টার মশাই?

শিক্ষক। ঠিক ত। জন্মাবার পর থেকে, যে শিশু হাসি খুসি ও হাত-পা ছুড়ে খেলতে থাকে, সে যে-পরিমাণে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, যে শিশু তা করে না, যেখানে শুইয়ে রাখে, সেইখানেই শুয়ে থাকে হাত-পা নাড়ে না, হাসি-, খুসিও করে না, সে শিশু দিন দিন রোগা হ'তে থাকে, পাঁচটা রোগ এসে জড়িয়ে ধ'রে একেবারে রুগ্ন ক'রে তোলে, তা দেখেছ ত ?

ছাত্র। এ ত নতুন কথা নয়, এ ত সকলেই জানে, তবে এ কথা বলবার মানে কি মাষ্টার মশাই ?

শিক্ষক। অর্থ কি জান, এইখানেই বুঝতে হবে, দেহে ও মনে স্ফূর্ত্তি না জাগলে যেমন শিশুর হাসি-খুসি, হাত-পা ছোড়া আসে না ; তেমনি ঠিক এর উল্টো দিকে যে-শিশুর মুখে হাসি ফোটে না, হাত-পা ছুড়ে খেলা করতে ইচ্ছে হয় না। তাকে বুঝতে হবে তার দেহ ভাল নয়, মনেও স্ফূর্ত্তি নাই।

ছাত্র। ভাল কথা। শিশুরা হাত-পা ছুড়ুক, আর নাই ছুড়ুক তা'তে আমাদের সঙ্গে কি যোগ আছে ?

শিক্ষক। তুমিও ত এক সময়ে শিশু ছিলে, আজই না হয় মায়ের কোল ছেড়ে হাঁটতে শিখেছ। এখন বল দেখি, সেই ছেলে-বেলাকার হাত-পা ছোড়া অভ্যাস যদি ছেড়ে দাও, কেবল বই মুখে ক'রে বসে থাক, তা'তে হাত-পা না ছোড়া শিশুর মত তোমার শরীর খারাপ হবে না কি ?

ছাত্র। শরীর খারাপ হ'লেই বা, পড়া-শুনা ত হবে ?

শিক্ষক। ঐটেই ভুল বুঝেছ—পড়া-শুনা কি ক'রে হবে ? রাত-দিন পড়ে পড়ে শরীর যদি রুগ্ন হ'য়ে পড়ে তবে পড়বে কে ? শরীর ভাল থাকলে তবে ত পড়ায় মন যাবে। তাই বলি, শিশু যেমন হাত-পা ছুড়ে খেলা করে, তেমনি তোমাদেরও লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফালাফি, ছুটোছুটি; কুস্তি

জিম্‌নাষ্টিক্ করতে হবে, তবেই দেহ ও মন সুস্থ থাকার সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়া হ'তে থাকবে। তাই দেশের শিক্ষানিকেতনের বড় কর্ত্তারা স্কুলে স্কুলে ব্যায়ামাগার খুলে, ছেলেদের যোগ দিতে উপদেশ দিয়েছেন।

ছাত্র। শরীর চালনা বা ব্যায়াম, ছেলে বুড় ক'রে সকলেরই করা উচিত, তা কচি শিশুর দৃষ্টান্তে মনে গেঁথে গেছে। তবে মেয়েদের বেলায়ও কি তাই মাষ্টার মশাই ?

শিক্ষক। মেয়েদেরও শরীর-চর্চ্চা দরকার, বিশেষতঃ যারা গৃহস্থালীর কাজ করে না,—যেমন বাসন-মাজা, জল-তোলা, রান্না-করা, বিছানা-তোলা-পাড়া করা, ছেলে-মানুষ-করা ইত্যাদি।

শরীর খারাপ হ'লেই বা, পড়াশুনা ত হবে ?

শিক্ষক। অনেকে বলে যে, গুণ্ডামির জন্যই ব্যায়াম। তা' যদি হ'ত তা' হলে বড় বড় মাথাওয়ালা মহাপুরুষেরা স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলন করতেন না। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথিতনামা ব্যারিষ্টার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীরাও ব্যায়াম করতেন।

ছাত্র। অনেক ছেলেকে দেখেছি, তারা কুস্তি বা জিম্‌নাষ্টিক্ শিখতে গিয়ে লেখা পড়ায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েছে।

শিক্ষক। এও একটা খুব দামি কথা বটে। নিয়মমত ব্যায়ামও করতে হবে সঙ্গটাও ভাল রাখতে হবে, কেননা সঙ্গটা ভাল থাকলে স্বভাব চরিত্র খুব ভাল থাকে। সৎ সঙ্গে যেমন খারাপ ছেলে ভাল হ'য়ে যায়, অসৎ সঙ্গে তেমনি ভাল ছেলেও খারাপ হ'য়ে যায়। তাই স্বভাব-চরিত্র যা'তে ভাল থাকে সকলের আগে তাই করতে হবে। আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে ;—

"যদি না পড়িল পো,
তবে সৎ সঙ্গে থো।"

এর মানে কি জান, বাপ যদি পয়সার অভাবে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে না পারেন, সে ছেলে মূর্খ হ'য়ে থেকেও যদি সৎসঙ্গে স্বভাব ভাল রাখতে পারে, তা' হলে যা ক'রে হোক সে দুমুঠো ভাতের সংস্থান করতে পারবে, আর হাজার লেখাপড়া শিখে, সে যদি অসৎ সঙ্গে নষ্ট হ'য়ে যায়, তার দুঃখের শেষ থাকে না। কাজেই যাতে দুঃখ হয় সেটা ত্যাগ ক'রে সুখের পথ ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ। তোমরা সৎসঙ্গে মেশ সুখ পাবে, সারা জীবন বেশ সুখে কাটাতে পারবে।
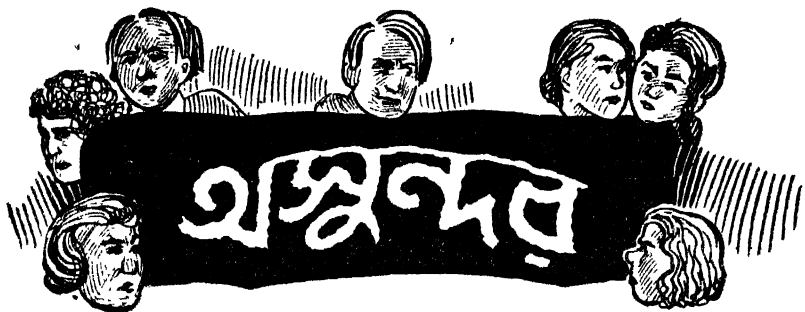
সংযোগপুরের রাজাদের কথাই বলছি। অবশ্য এখন তাঁদের আর রাজ্য নাই—আছে জমিদারি, তবুও তাঁদের রাজা খেতাব ঠিক আছে।—রাজার দুই রাণী—সুয়ো আর দুয়ো। ছোট রাণী হচ্ছেন সুয়ো আর বড়রাণী দুয়ো।

রাজা বড়রাণীকে দেখতে পারেন না, তাই বড়রাণীর জন্য বাগানের এক কোণে কুঁড়ে ঘর ক'রে দিয়েছেন। বড়রাণী তার ছেলে মটুককে নিয়ে সেই কুঁড়ে ঘরে থাকেন। দুঃখে কষ্টে দিন কেটে যায়। এদিকে ছোটরাণী অট্টালিকায় বাস করেন,—সাত ছেলে নিয়ে পরম সুখে।

ছোটরাণীর সাত ছেলে রাজার হালে দুধ ঘি খেয়ে মানুষ হ'তে লাগল, আর দুঃখিনী বড়রাণীর সবে ধন নীলমণি মটুকের দুঃখের অন্ত নাই। তবু সাত ভাই তাকে ঈর্ষা করতে ছাড়ে না।

এমনি দুঃখ ও দুর্দ্দশার মধ্যে কয়েক বৎসর কাটল।

এই সময়ে ছোটরাণীর সাত ছেলে, হরিণ কেনবার জন্যে মা'র কাছে আব্দার

ধরল। ছোটরাণী ছেলেদের আব্দার ঠেলতে পারলে না, রাজাকে ব'লে সেই দিনেই সাতটা হরিণ কি'নে আন্‌তে লোক পাঠালেন। একটা নয় দুটো নয়, সাত সাতটা হরিণ এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে হরিণদের দেখবার জন্যে সাত সাতটা চাকর এল।

সাত ছেলের আহ্লাদ আর ধরে না, হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল। এক দিকে যেমন হাসির তুফান ছুটল, অপরদিকে তেমনি কান্নার পালা পড়ল। ভায়েদের হরিণ দেখে, মটুকেরও হরিণ পুষতে মন ছুটল। কিন্তু হরিণ পায় কোথা। হাতে একটা পয়সা নেই যে হরিণ কেনে। সে মা'র কাছে ছুটে কেঁদে পড়ল,—মা, আমায় হরিণ কেনবার পয়সা দাও।

বড়রাণীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল, বললেন,—হরিণ কি হ'বে?

মটুক বললে,—নিয়ে খেলা করব।

বড়রাণী বড় ফাঁপরে পড়লেন, বললেন,—তোর আবার এ খেয়াল চাপল কেন?

মটুক বললে,—ঐ যে ভায়েরা হরিণ কিনেছে,—আমিও কিনব।

ওরা বড়মানুষ, ওদের সঙ্গে তুলনা কিসের।

মটুক জলভরা চোখে বললে,—তুমি যাই বল মা, হরিণের জন্যে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়নি,—হরিণ আমার চাই।

মটুকের চোখে জল দেখে, বড়রাণী আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না। অতি কষ্টে খুঁজে পেতে পাঁচ সিকা মটুকের হাতে দিয়ে বললেন,—বাছা, অনেক কষ্টে এই পেয়েছি, মাথা খুঁড়লেও আর মিল্‌বে না।

মটুক আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বললে,—ঐতে খুব হবে মা, খুব হবে। এই ব'লে মা'র হাত থেকে পাচ সিকা নিয়ে বাজারে ছুটল।

সমস্ত দিন গেল সন্ধ্যা হ'ল, তবুও মটুকের দেখা নাই। বড়রাণী ছেলের জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। জলে দু'চোখ ভরে গেল, সেই সময় মটুক ধীরে ধীরে কুটীরের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল,—সঙ্গে একটা হরিণ। হরিণের চেহারা দেখে ঘৃণায় বড়রাণী বলে উঠলেন,—একি করেছিস্ রে! এ মরা কাণা হরিণ কি ব'লে কিনে আনলি!

মটুক তাতে দমে না গিয়ে বললে,—দেখবে মা দেখবে, দু'দিন বাদে কেমন চেহারা হয় দেখবে।

পরদিন মটুক খোঁটা পুঁতে মস্ত এক দড়িতে হরিণকে বেঁধে বাগানে চরতে দিলে। হরিণ মনের আনন্দে বাগানের ঘাস খেয়ে চরে বেড়াতে লাগল। দেখতে দেখতে সেই রোগা হরিণ মোটা সোটা হ'য়ে উঠল। এদিকে কিন্তু ছোটরাণীর ছেলেদের হরিণগুলোকে চাকরেরা যখন তখন খাইয়ে রোগ ধরিয়ে দিল।

মটুকের হরিণকে দিন দিন মোটা হ'তে দেখে ছোটরাণীর সাত ছেলের ঈর্ষা জেগে উঠল, ভাবলে,—মোটকোর কি জোর বরাত, কোথেকে একটা মড়াখেকো কাণা হরিণ নিয়ে এল, খাওয়াতে হয় না, মাঠের ঘাস খেয়ে পেট ভরায়, তা'তেই কি মোটা হ'য়ে উঠেছে,—আর আমাদের হরিণের পেছনে সাত সাতটা চাকর, ভাল ভাল জিনিস খাওয়াচ্ছে, তবু মোটা হয় না, হেগে হেগেই সারা হয়, দিন দিন যেন শুকিয়েই যাচ্ছে। আচ্ছা ভাই আমাদের হরিণগুলো কি মোটকোর হরিণের মতন মোটা হয় না?

১ম রাজপুত্র। মোটা হবে না কেন, ঘাস খাওয়াতে পারলে হয়।

২য়। ঘাস খাওয়াব কেন? মোটকোর পয়সা নাই, তাই ঘাস খাওয়ায়, আমরা ত মোটকোর মতন গরীব নই যে, ঘাস খাওয়াব।

৩য়। ঠিক বলেছ ভাই।

৪র্থ। তবে আমাদের হরিণগুলো মোটা কি করে হবে ?

৫ম। যার আড়া মোটা, সে খেলেও হয়, না খেলেও হয়।

৬ষ্ঠ। তাইত, হরিণগুলোকে এত যত্ন ক'রে ভাল ভাল জিনিস খাওয়ান হচ্ছে তবু মোটা হচ্ছে না। কেন জান ? এই হরিণগুলোর আড়া মোটা নয়,— তা হ'লে এতদিন মোটকোর হরিণকে ছাপিয়ে উঠত।

৭ম। আমাদের হরিণগুলোর দফা রফা হ'য়ে গেছে, ওদের আর কোনও পদার্থ নাই। আমরা যাই বলি না কেন মোটকোরই জিৎ।

১ম। জিৎ কিসে ?

৭ম। মোটকোর হরিণ কেমন সুন্দর ও সুডৌল, সে হরিণের সঙ্গে ছুটোছুটি ক'রে যে হাসি হাসে, দেখলে বুকটা জ্বলে ওঠে। এস এক কাজ করা যাক্ ব'লে চুপি চুপি সকলে কি একটা পরামর্শ করল।

একদিন মটুকের বেড়িয়ে আসতে রাত হয়েছে, এসে দেখে হরিণটা মরে প'ড়ে আছে। মটুকের দুঃখের অন্ত রইল না, কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলে, অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর মাকে বললে,—মা, আমার হরিণকে কে মারলে ?

মারবে আবার কে ? যারা তোকে দেখতে পারে না, ঈর্ষায় মরে যায়, তারাই মেরেছে, জানিস্ ত সব, আবার জিজ্ঞেস কচ্ছিস্ কেন ?

এমন যদি হয় মা, তবে এখানে কেমন ক'রে থাকব মা !—চল আমরা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাই !

কোথা যাবি বাপ্ ! আমাদের কি মাথা রাখবার জায়গা আছে যে, সেখানে গিয়ে থাকব !

তা যদি না থাকে, তুমি থাক মা ! আমি চল্লুম ! একটা বিহিত না ক'রে ফিরছি না !

বলেই মটুক মরা হরিণটাকে কাঁধে নিয়ে চলল।

মা আমায় হরিণ কেনবার পয়সা দাও
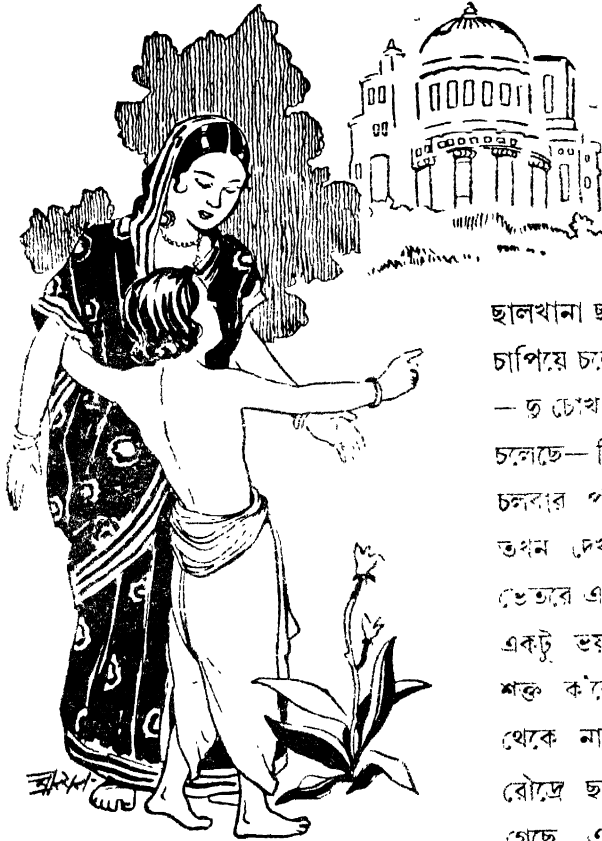
জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা দেড়টা। রোদ্দুরে চারদিক খাঁ খাঁ করছে। মাঠ ফেটে চৌচির হ'য়ে গেছে। সেই দারুণ রোদ্রে, মটুক হরিণের ছালখানা ছাড়িয়ে নিয়ে, মাথার ওপর চাপিয়ে চলেছে। একমনে চলেছে,—দু চোখ যেদিকে যাচ্ছে সেইদিকে চলেছে—বিরাম নাই। অনেকক্ষণ চলবার পর, যখন তার জ্ঞান হ'ল, তখন দেখলে, সে একটা বনের ভেতরে এসে পড়েছে। প্রথম তার একটু ভয় হ'ল। তারপরে মনকে শক্ত ক'রে, হরিণের ছালটাকে মাথা থেকে নামিয়ে রেখে দিল। প্রখর রোদ্রে ছালটা শুকিয়ে মড়মড়ে হয়ে গেছে, একটু মোচড় দিলেই খট্‌মট্ শব্দ ক'রে ওঠে। ক্রমে অন্ধকার হ'য়ে এল। মটুক সে রাত্রির মত একটা বড় ঝাঁকড়া গাছের আগডালে চড়ে, ছালটাকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে, সাবধানে বসে রইল।

রাত যখন ছুটো, তখন একদল ডাকাত লুটপাট ক'রে সেই বনের ভেতর দিয়ে মশাল জ্বেলে যাচ্ছিল। দৈবক্রমে তারা সেই গাছের তলায় এসে ভাগ-বাটরা করতে বসল। ডাকাতদের ভেতর একজন রাতকাণা ছিল। সে বললে,—দেখিস্ ভাই, যেন আমার ভাগে কম দিস্ নে। যদি কম দিস্ তা'হলে খট্-মট্ ভূতে তোদের ঘাড় ভাঙবে।

বাস্তবিক সেই ডাকাতটা রাত্তিরে কম দেখত, তাই তার ভাগে কমই পড়ছিল। মটুক কথাগুলো গাছের ওপর থেকে শুনতে পেল। 'লাগে তাক্ না লাগে তুক্কা' এই ব'লে সে ছালখানা দুহাতে ধ'রে সজোরে মোচড় দিল। মোচড় দিতেই ছালখানা 'খট্-মট্' শব্দ করে উঠল। আর যায় কোথা। ডাকাতগুলো সত্যি সত্যি ভূতে ঘাড় ভাঙবে মনে ক'রে সব লুঠের-জিনিস ফেলে দৌড় দিল। মটুক গাছের-ওপর থেকে সবই দেখল। যখন বুঝল, মশালের আলো আর দেখা যাচ্ছেনা, তখন আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামল, লুঠের জিনিস, টাকা-কড়ি, গয়না-গাটি, সব নিয়ে একটা পুঁটুলি বেঁধে বাড়ির দিকে ছুটল।

তখনও রাত শেষ হয় নি। ধীরে-ধীরে দরজায় ঘা মেরে, আস্তে আস্তে মা—মা ব'লে ডাকল। মটুকের গলার স্বর পেতেই মা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। বললেন,—এতক্ষণ কোথা ছিলি বাপ্! তোর পিঠে ওটা কি! দেখচি টাকার পুঁটুলি! টাকা কোথা পেলি! চুরি ক'রে আনলি নাকি! সর্ব্বনাশ!

মটুক বেশ জানে যে, তার চারদিকে শত্রু। পাছে চীৎকার ক'রে গোল বাধায়, সেই ভয়ে মাকে চুপি চুপি বললে,—ও সব কিছু নয়, ঘরের ভেতর চল মা, গোল ক'রো না।

মাতা ও পুত্র ঘরের মধ্যে গেল। মটুক, চুপে-সাড়ে মাকে সকল কথাই বলল। পরে টাকা-কড়ি, গয়না-গাটি ঘরের মেঝেয় গর্ত্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখল।

পরদিন সকাল হ'তে না হ'তে বিস্তর মজুর নিয়ে এসে ভিত খুঁড়তে আদেশ দিল। দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড এক চক মিলান বাড়ি উঠে গেল। সেই বাড়িতে মা ও ছেলে পরম সুখে বাস করতে লাগল,—মটুকের মুখে আবার হাসি ফুটল।

শত্রু ভায়েরা বুঝে ঠিক করতে পারলে না এ কি ক'রে হ'ল। মোটকো এত টাকা কোথা থেকে পেল। ঈর্ষায় তাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবার মতন হ'ল। ব্যাপারখানা কি, তা জানবার জন্য সকলেরই মনে উৎকণ্ঠা জেগে উঠল। পরস্পর বলাবলি করতে লাগল। একজন বললে,— মোটকো নিশ্চয় যাদু জানে।

তাই যদি না হবে, তবে এত টাকা পেলে কোথা?

নিশ্চয় চুরি করেছে।

এ ত মগের মুল্লুক নয় যে, চুরি করবে।

তবে কি—তবে কি! টাকাগুলো বানের জলে ভেসে এল নাকি?

ভেসে আসবে কেন, বাবার নাম ক'রে কোন রকমে যোগাড় করেছে,—চালাক ছেলে কিনা?

এত বোকা কেউ নয় যে, একটা ভিখিরীকে এক সঙ্গে অত টাকা দিয়ে দেবে। ও সব বাজে কথা।

এখন জানা উচিত, কিসে মটুক অত টাকা পেলে?

জানতে যাবে কে? আমি কিন্তু ওর কাছে যেতে পারব না।

আমাদের কা'কেও যেতে হবে না, গদাই খুব চালাক-চতুর, ঐ চালাকি ক'রে মোটকোর মনের কথা সব বার ক'রে নিয়ে আসবে।

তাই ভাল।

সকলের মতে গদাইকে ডাকা হ'ল। গদাই হাত মুখ নেড়ে, নিজের খুব বাহাদুরি জানিয়ে বেশ দু পয়সা আদায় ক'রে নিয়ে, মটুকের উদ্দেশে চলল।

মটুক সবেমাত্র আহারাদি শেষ ক'রে পান চিবুচ্ছে, এমন সময় গদাই একটা ভণিতা ক'রে মটুকের কাছে উপস্থিত হ'ল। এটা সেটা, একথা সে-কথার পর হরিণের কথা পাড়ল।

মটুক গদাইকে বিলক্ষণ চিনত। সে যে ভায়েদের হাত ধরা, তা বেশ জানত। তার ভায়েরাই যে সন্ধান নেবার জন্য ওর কাছে পাঠিয়েছে, তা এক আঁচড়েই বুঝে নিল, এবং গদাই যেমন যেমন প্রশ্ন করতে লাগল মটুকও মুখের উপর সেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল।

মটুকের ওপর খুব ভালবাসা জানিয়ে আদরের ডাক ডেকে গদাই বললে,—আচ্ছা বড়কুমার! অমন হরিণটা কে মারলে বলুন ত?

কে মারবে আর, কেউ মারে নি। আমার ত আর কেউ শত্রু নাই যে, হরিণটাকে মেরে রাগের শোধ নেবে,—রোগে মরেছে। যাই হোক্ হরিণটা খুব পয়মন্তর ছিল, মরেও মরে নি!

গদাই বেশ বুঝল যে, ওরই সাত ভাই যে, হরিণটাকে মেরে ফেলেছে, তা মটুক আদবেই জানতে পারে নি। কাজেই মটুক যে আস্ত বোকা, এ রকম বোকার কাছ থেকে পেটের কথা বার করতে বেশি দেরি হবে না, এই ভেবে বললে,—হরিণটা বড় পয়মন্তর, এ কথার অর্থ কি বড়কুমার?

অর্থ-টর্থ কিছু নয়,—যা সত্যি ঘটেছিল তাই বলছি শোন। বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখি, হরিণটা অক্কা পেয়ে গেছে। দেখে যে কি কষ্ট হ'ল তা বলবার নয়! প্রাণটা যেন ফেটে গেল! খানিকক্ষণ ডাক ছেড়ে খুব কাঁদলাম! তারপর ভাবলাম, যাকে আমি এত ভালবাসতাম তার সদ্গতি দরকার! এই মনে ক'রে, মরা হরিণটাকে কাঁধে নিলাম! নিতেই পূর্ব্বের ভালবাসা মনে এসে এমন হ'ল যেন আমাতে আর আমি নাই! চলেছিত চলেছি! কোথায় চলেছি

তার ঠিক নাই! এক জায়গায় এসে এমন হ'ল যে, সেখান থেকে আর নড়তে দিলে না।

গদাই হাঁ ক'রে মটুকের কথাগুলো আস্ত আস্ত গিলছিল। মটুক থামতেই ব'লে উঠল,—নড়তে দিলে না, কারা নড়তে দিলে না, কি জন্যে নড়তে দিলে না, কেনই বা নড়তে দিলে না, এই রকম হাজার হাজার প্রশ্ন ক'রে বসল।

মটুক তখন মনে মনে সন্তুষ্ট হ'য়ে কার্য্যসিদ্ধির আর বিলম্ব নাই ভেবে,

. সাত সাতটা হরিণ মেরে তারা কাঁধে ক'রে

আবার আরম্ভ করলে,—নড়তে দিলে না বা নড়তে পারলাম না, কেন জান? দেখলাম আমাকে চারদিকে বিস্তর লোক ঘিরে ফেলেছে, যেন বেড়া জালে পড়ে গেছি, আর সেই সঙ্গে কি চেঁচামেচি,—হরিণের মাংস খাব! হরিণের মাংস খাব!

জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম,—সে দেশে হরিণের মাংস অতি পবিত্র, দেব সেবায় লাগে। আর সেখানে হরিণের মাংস সহজে মেলে না। আমার কাছে

একটা টাটকা গোটা হরিণ, তাও রোগা নয়, মোটা-সোটা, তখন সকলেই সেই টাটকা মাংস কেনবার জন্যে ভিড় লাগিয়ে দিলে। আমিও ছাড়বার পাত্র নই বেজায় দর চড়িয়ে দিলাম,—সিকি ভরি মাংসে এক টাকা দর দিলাম। তাই, পড়তে পেলে না, নিমিষের মধ্যে অত বড় হরিণ কোথায় উবে গেল। রাশি রাশি টাকা নিয়ে ঘরে ফিরলাম। কত টাকা ঘরে ঢুকিয়েছি তা এই বাড়িখানা দেখেই বুঝতে পারছ।

যে খবরের জন্যে গদাই এসেছিল, সে কাজ হাসিল হ'তেই একটা অছিলা ক'রে এমন ভাবে চলে গেল, যেন সে মটুকের মন থেকে বাহাদুরি দেখিয়ে সব কথা বার ক'রে নিয়েছে, সে না হ'লে কারও সাধ্য নাই যে বার করে।

মটুকের কাছ থেকে গদাই একেবারে সাত ভায়ের কাছে উপস্থিত হ'ল। পরের মনের কথা বার করতে সে যে একজন বিলক্ষণ পটু, এবং অনেক বাহাদুরি ক'রে মটুকের মত চতুর লোকের কাছ থেকে যে, তার মনের কথা বার করে নিয়ে এসেছে, এজন্যে নিজে নিজেকে অনেক ধন্যবাদ দিলে, আর তাদেরও বুঝিয়ে দিলে যে, উত্তর দিকে এমন একটা দেশ আছে যেখানে হরিণের মাংস টাকায় সিকি ভরি বিক্রি হয়।

সাত ভাই গদাইকে বেশ কিছু সন্তুষ্ট ক'রে তখন মতলব পাকাতে লাগল। মোটকো কেবল একটা হরিণ বেচে অত টাকা পেয়েছে তাদের সাত সাতটা হরিণে যে কত টাকা আসবে তার ঠিক ঠিকানা নাই। যেমন কথা তেমনি কাজ। সাত সাতটা হরিণ মেরে তারা কাঁধে ক'রে উত্তর দিকে চলল। অনেক দূর গিয়ে একটা গ্রামে এসে পড়ল। সাতভাই বললে,—এই ত সেই গ্রাম, যে গ্রামের কথা গদাই মোটকোর কাছে শুনে এসেছে। তখন তারা 'হরিণের মাংস চাইগো!' 'হরিণের মাংস চাইগো!' বলে চীৎকার জুড়ে দিল। গ্রামের লোক

হরিণের মাংস কেনবার জন্যে দলে দলে এসে জিজ্ঞেস করলে,—'কত ক'রে সের।' সাতভাই রেগে খুন। বলে—'সের-টের নয়, সিকি ভরি মাংস দোব, একটাকা দাম নোব!' এই হয় ত বিক্রী করব, নয় ত এক ছটাকও পাবে না।

গ্রামের লোকেরা বলে—পাগল নাকি? যাও! যাও! ঘরে গিয়ে মাংস পচিয়ে খাওগে! এখানে চালাকি চলবে না। ব'লে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিল।

মটুকের চালাকি এখন তাদের কাছে জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেল,—মনে অনুশোচনা এল। ঈর্ষা মানুষকে কতখানি অসুন্দর ক'রে তোলে, এতদিনে তারা বেশ বুঝতে পারল।

মহাভারতের বনপর্ব্বের কথা।

কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে পাশাখেলায় বাজি হইল—যাহারা হারিবে, তাহাদিগকে বারবৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। যুধিষ্ঠিরকে অন্যায় ভাবে হারাইয়া দেওয়া হইল।

পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লইয়া দ্বৈতবনে বাস করিতে আসিলেন। নিকটেই তপোবন—সকাল সন্ধ্যায় তাপসগণের বেদগান ও মন্ত্রপাঠের পবিত্র ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিয়া পাণ্ডবদের কানে মধুবর্ষণ করিত। ক্ষণকালের জন্যও তাঁহারা রাজ্য হারাইবার ব্যথা ভুলিয়া যাইতেন। এমনি ভাবে তাঁহাদের দিন কাটিত।

একদিন এক তাপস আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—রাজন্, হবিঃ প্রস্তুত করিবার মন্থনদণ্ড আমি গাছে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলাম—একটি হরিণ যখন সেই

গাছে গা ঘসিতেছিল, উহার শিঙে মন্থনদণ্ড আটকাইয়া যায়। হরিণ বনের দিকে পলাইয়া গিয়াছে। হরিণের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করিয়া হরিণটিকে ধরিয়া আমার মন্থনদণ্ড উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

ধর্ম্মভীরু যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব হরিণের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

হরিণ পঞ্চপাণ্ডবকে অনেক নাকাল করিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইল।

পাণ্ডবেরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। একটি গাছের তলায় তাঁহারা বিশ্রাম করিতে বসিলেন। পিপাসায় কাতর হইয়া যুধিষ্ঠির নকুলকে জলের অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। নকুল একটি উচ্চ গাছের উপর উঠিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন নিকটে কতকগুলি সারস ও বক চরিয়া বেড়াইতেছে। নিশ্চয়ই ওখানে জল আছে—এই মনে করিয়া তিনি গাছ হইতে নামিয়া কিছুদূর গিয়া দেখেন,—বাস্তবিক এক সরোবর। ছুটিয়া গিয়া জল পান করিতে যাইবেন এমন সময়ে নকুল শুনিলেন, কে যেন বলিতেছে,—সাবধান, জল পান করিও না, এ জলাশয় আমার। আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর যদি দিতে পার, তবে জল পান করিতে পাইবে অন্যথা তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। নকুল চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া জল পান করিবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

এদিকে নকুলের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির সহদেবকে পাঠাইলেন। সরোবর-তীরে দাদাকে মৃত দেখিয়া চারিদিকে তাকাইলেন। কোথাও শত্রুর চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। প্রথমে জল পানে সুস্থ হইয়া পরে শত্রুর অন্বেষণ করিবেন স্থির করিয়া জল পান করিতে যাইবেন, এমন সময় তিনিও শুনিলেন,—কে যেন বলিতেছে—বৎস, এই সরোবর আমি আগেই অধিকার করিয়াছি,—সেইজন্য আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া পরে জল পান করিও,—নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত। সহদেব
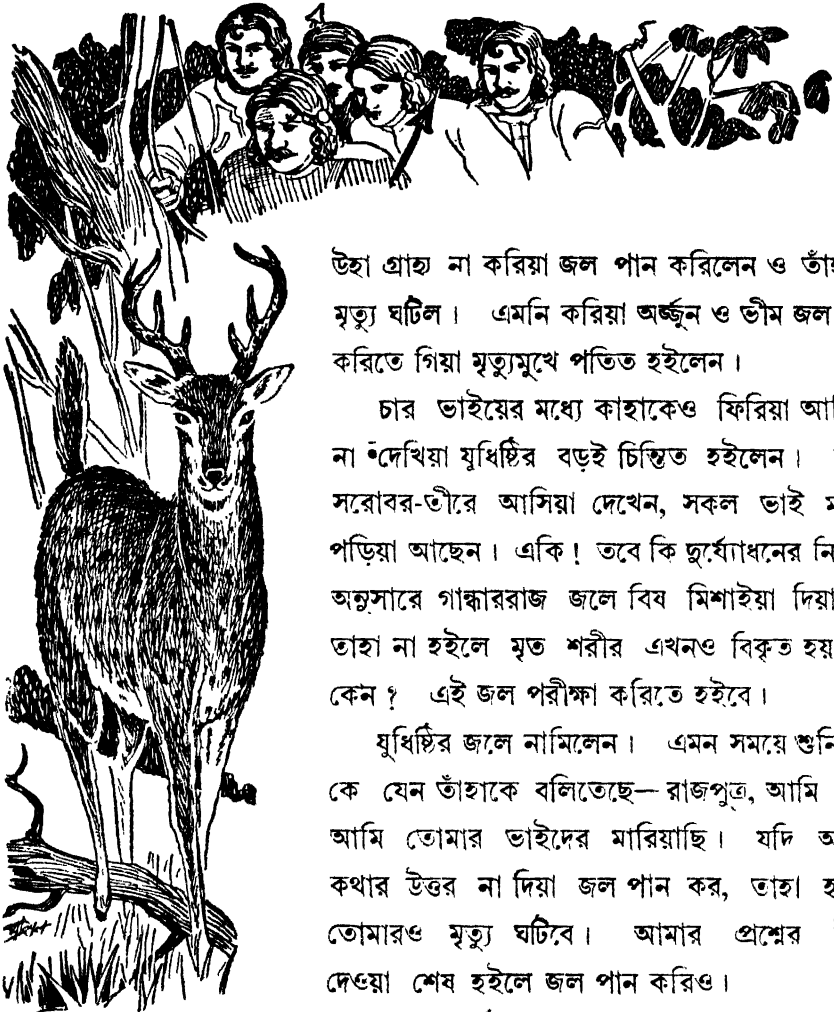
উহা গ্রাহ্য না করিয়া জল পান করিলেন ও তাঁহারও মৃত্যু ঘটিল। এমনি করিয়া অর্জ্জুন ও ভীম জল পান করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

চার ভাইয়ের মধ্যে কাহাকেও ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া যুধিষ্ঠির বড়ই চিন্তিত হইলেন। তিনি সরোবর-তীরে আসিয়া দেখেন, সকল ভাই মরিয়া পড়িয়া আছেন। একি! তবে কি দুর্য্যোধনের নির্দ্দেশ অনুসারে গান্ধাররাজ জলে বিষ মিশাইয়া দিয়াছে? তাহা না হইলে মৃত শরীর এখনও বিকৃত হয় নাই কেন? এই জল পরীক্ষা করিতে হইবে।

যুধিষ্ঠির জলে নামিলেন। এমন সময়ে শুনিলেন কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে—রাজপুত্র, আমি বক। আমি তোমার ভাইদের মারিয়াছি। যদি আমার কথার উত্তর না দিয়া জল পান কর, তাহা হইলে তোমারও মৃত্যু ঘটিবে। আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হইলে জল পান করিও।

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর,

রাক্ষস প্রভৃতি যাঁহাদের সহিত যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না, আমার সেই ভাইদের এত সহজে যিনি শমন সদনে পাঠাইতে পারেন—তিনি ত সামান্য বক হইতে পারেন না। বলুন, আপনি কে?

বক বলিল—বাস্তবিক আমি বক নহি—আমি যক্ষ। কথা শেষ হইতে না হইতেই যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে এক বিশাল যক্ষের আবির্ভাব হইল।

যক্ষ বলিল—যুধিষ্ঠির, তোমার ভ্রাতৃগণকে আমি বার বার বারণ করিয়াছিলাম যেন আমার কথার উত্তর না দিয়া জল পান না করে। কিন্তু তাহারা আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া জল পান করিয়াছে—সুতরাং তাহাদের এই অবস্থা।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—বেশ, আপনার অধিকৃত সরোবরের জল আমি পান করিব না। আপনার কি জিজ্ঞাস্য তাহা বলুন,—আমার সাধ্য মত উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

যক্ষ প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন—যুধিষ্ঠির যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন।

প্রঃ। বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে?

উঃ। মন।

প্রঃ। কাহার সংখ্যা তৃণ অপেক্ষা বহুতর?

উঃ। চিন্তা।

প্রঃ। কে নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত করে না?

উঃ। মৎস্য।

প্রঃ। কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না?

উঃ। ডিম্ব।

প্রঃ। কাহার হৃদয় নাই?

উঃ। পাষাণের।

প্রঃ। কে বেগে বর্দ্ধিত হয়?

উঃ। নদী।

প্রঃ। প্রবাসীর মিত্র কে?

উঃ। সঙ্গী।

প্রঃ। আতুরের মিত্র কে?

উঃ। চিকিৎসক।

প্রঃ। মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র কে?

উঃ। দান।

প্রঃ। কি ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়?

উঃ। অভিমান।

প্রঃ। কি ত্যাগ করিলে সুখী হয়?

উঃ। লোভ।

প্রঃ। পুরুষের কোন্ শত্রু দুর্জ্জয়?

উঃ। ক্রোধ।

প্রঃ। সাধু কে?

উঃ। সকল হিতকারী ব্যক্তিই সাধু।

প্রঃ। অসাধু কে?

উঃ। নির্দ্দয় ব্যক্তিই অসাধু।

প্রঃ। প্রিয়বাক্য কহিলে কি লাভ হয়?

উঃ। প্রিয়বাদী সকলের প্রিয় হয়।

প্রঃ। বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিলে কি লাভ হয়?

উঃ। বিবেচক ব্যক্তি অধিকতর জয়লাভ করে।

প্রঃ। সুখী কে?

ধর্ম্মবকের প্রশ্ন

উঃ। যিনি অঋণী ও অপ্রবাসী।

প্রঃ। পণ্ডিত কে? মূর্খ কে?

উঃ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত। নাস্তিকই মূর্খ।

প্রঃ। অহঙ্কার কি?

উঃ। অজ্ঞানরাশি অহঙ্কার।

প্রঃ। প্রকৃত পুরুষ কে?

উঃ। মানুষের নাম পুণ্যকর্ম্মে ভূমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে। যে পুরুষের নাম এইভাবে জগতের সকল লোক জানিতে পারে ও শ্রদ্ধা করে, সেই প্রকৃত পুরুষ।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাইয়া যক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া, বলিলেন—হে রাজন্, তোমার ভাইদের মধ্যে যে কোন একজনের জীবন প্রার্থনা করিতে পার।

যুধিষ্ঠির আনন্দিত হইয়া বলিলেন—আপনি নকুলের প্রাণদান করুন।

যক্ষ বলিলেন—রাজন্, মহাবলশালী ভীম এবং মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনের প্রাণ ভিক্ষা না চাহিয়া, বৈমাত্র ভ্রাতা নকুলের জীবন প্রার্থনা করিতেছ কেন?

যুধিষ্ঠির বলিলেন—আমি যদি ধর্ম্ম ত্যাগ করি, তাহা হইলে ধর্ম্ম আমায় ত্যাগ করিবে। ধর্ম্মহীন জীবন মানুষের কাম্য নয়। আমার পক্ষে কুন্তী ও মাদ্রী উভয়েই আমার মাতা। উভয়ের প্রতি সমান কর্ত্তব্য সাধন আমার ধর্ম্ম। তাই আমি চাই নকুল জীবিত হউক, তাহা হইলে আমার দুই মাতাই পুত্রবতী থাকিবেন।

যক্ষ প্রীত হইয়া বলিলেন—রাজন্ তোমার সকল ভ্রাতাই জীবিত হউক। আমি ধর্ম্ম,—তোমায় পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। তুমি পরীক্ষায় জয়ী হইয়াছ। তুমি আজ জগতে দেখাইলে, মানুষ যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করে, ধর্ম্মও তাহাকে কখন ত্যাগ করে না।

এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী।

তারা একদিন তাদের একমাত্র ছেলে সঙ্গে নিয়ে নৌকো ক'রে শিষ্যবাড়ি যাচ্ছিল। হঠাৎ প্রবল ঝড়ে নৌকা ডুবে গেল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ও ছেলেটি কে কোথায় যে ভেসে গেল, তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। অজয় নদীর এক ঘাটে এক ব্রাহ্মণ জমিদার স্নান কচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, কয়েক হাত দূরে একটি ছোট ছেলে ভেসে যাচ্ছে। তিনি ছেলেটিকে জল থেকে তুলে সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। ছেলেটি বেঁচে গেল।

জমিদারের সংসারের মধ্যে জমিদার নিজে, তাঁর স্ত্রী ও একটি পাঁচ বছরের কন্যা ছাড়া আর কেউ ছিল না।

জমিদার অজয়কে খুবই ভালবাসতেন। এমন কি তাঁর মেয়ে মধুমালতীও তাকে ভালবাসত। কিন্তু জমিদারের স্ত্রী, অজয়কে মোটেই দেখতে পারতেন না। মেয়ে যাতে অজয়ের সঙ্গে খেলা না করে, সেজন্য দিন-রাত মধুমালতীকে চোখে চোখে রাখতেন। তিনি মেয়েকে বলতেন,—অজয়ের সঙ্গে খেলা ক'র না মা, ওরা গরীব ছোটলোক,—ছোটলোকের সঙ্গে কি মিশতে আছে?

মধুমালতী মায়ের কথাগুলি বুঝে উঠতে পারত না। সে দেখত অজয় তার চেয়ে কত বড়, কেমন ক'রে ও ছোট হবে।

এমনি ক'রে দিন কাটতে লাগল। জমিদার অজয়ের মা-বাপের অনেক খোঁজ খবর করলেন, তাঁদের কোন সংবাদই পেলেন না। অজয় তাঁর কাছেই থেকে গেল।

রাজার সঙ্গে জমিদারের খুব ভাব ছিল। একদিন জমিদার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, দেখেন তিনি রাজসভায় না বসে, এক অন্ধকার ঘরে গালে হাত দিয়ে আকাশ পাতাল ভাবছেন। জমিদার রাজাকে বললেন,—বন্ধু, রাজ্যে কি-এমন বিপদ ঘটেছে, যাতে আপনি এত বিমর্ষ।

রাজা বললেন,—সে কথায় আর কাজ নাই—সে এক কঠিন সমস্যা!

জমিদার বললেন,—কি সমস্যা শুনি?

রাজা বললেন,—রাণী দুটি প্রশ্ন করেছেন,—'গোড়ায় গলদ' ও 'অভিষিক্ত গর্দ্দভ।' দুইমাসের মধ্যে এই প্রশ্নের চাক্ষুস প্রমাণ দিতে হবে, দিতে না পারলে, রাণীর মনে যা আছে তাই করবে। বলে রাজা চিন্তিত হলেন।

জমিদার রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—বন্ধু, কোন চিন্তা নাই, আমি এর উত্তরের ব্যবস্থা করছি। বলে বিদায় নিলেন।

জমিদার বাড়ি ফিরলেন, তাঁর মন থেকে চিন্তা দূর হ'ল না। এ যে অদ্ভুত প্রশ্ন,—এর মীমাংসা কি ক'রে হবে? সেই সময়ে মধুমালতী এসে পড়ল, পিতাকে চিন্তিত দেখে বললে,—বাবা, আপনি এত ভাবছেন কেন? কি হয়েছে?

জমিদার বললেন,—সে কথা শুনে লাভ কি মা? রাজা ও আমি যখন ভেবে কিছু করতে পারিনি, তখন মা তুমি শুনে কি করবে?

বাবা, আমায় বলতে বাধা আছে কি?

না—না, তবে শোন্।

তিনি সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা মধুমালতীকে বললেন। মধুমালতী হেসে বললে —এই কথা! এর জন্যে চিন্তা কি? বেলা অনেক হয়েছে আপনি স্নানাহার করুন, পরে সব শুনব। সেই সময়ে মধুমালতীর মা এসে পড়লেন, পিতা ও পুত্রীর বিমর্ষভাব দেখে বললেন,—কি হয়েছে?

মধুমালতী মাকে সব কথা বললে। মা শুনে দুঃখ ক'রে বললেন,—তাইত মা! এর উপায় কি হবে?

উপায় হবে। বাবার মুখে রাজার প্রশ্ন শুনে অবধি উত্তরের কেমন একটা ভরসা এসেছে।

তাই বল্ মা! ভগবান্ তোর মতি-গতি ভাল রাখুক, এ দায় থেকে উদ্ধার হ'লে বাঁচি! তবে তুই একরত্তি মেয়ে, তোর জ্ঞান-বুদ্ধিই বা কতটুকু!

তুমি ভুল বুঝেছ মা, আমার দ্বারা পূরণ হবে, একথা বলছি না মা, তবে—

তবে কি,—তবে কি, আর কেউ আছে না কি?

আছে বৈ কি মা?

কে সে?

কেন, আমাদের অজয়দা।

মাতা কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকিয়া কি ভাবলেন, পরে বললেন,—কি করে জান্লি মা,—অজয় পারবে?

বাবার সব বিপদে ঐ ত রক্ষা ক'রে আস্ছে।

আচ্ছা,—তাই যদি হয়, তুই একবার অজয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে এর একটা বিহিত কর্ মা।

আচ্ছা মা।

কিছু পরে জমিদার গৃহিণী স্বামীকে ডেকে হাসি মুখে বললেন,—শুনেছ অজয় কি বলেছে?

অজয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে

কি বলেছে?

বলেছে, তোমার প্রশ্নগুলোর সপ্রমাণ উত্তর সে দিতে পারবে।

কা'কে বলেছে ?

মধুমালতীকে।

আর কি বলেছে ?

আর বলেছে,—মাসে মাসে দু'শ টাকা বরাদ্দ ক'রে, তাকে বিদেশে পাঠাতে হবে। অজয় যেখানে থাকবে সেখানকার চিঠি এলেই ঐ টাকা পাঠান দরকার হবে।

যে বিপদে পড়েছি, এত সামান্য টাকা। অজয় যে রকম বুদ্ধিমান ছেলে, ও যখন লেগেছে, তখন একটা হেস্ত-নেস্ত না ক'রে ছাড়বে না।

তবে আজই ওর যাবার উদ্যোগ কর না কেন ?

দেরি ক'রে কাজ কি, এখনই ওর যাবার ব্যবস্থা করিগে।

দুই মাস পূর্ণ হবার কিছু পূর্ব্বে, অজয় ঐ রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হ'ল এবং সেই দেশের এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করলে। সংসারের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ও একটি দশ বৎসরের কন্যা। কন্যা সময়ে সময়ে অজয়ের নিকটে সোনার হারের বায়না ধ'রে কান্না জুড়ে দিত, অজয় দিব ব'লে তাকে ঠাণ্ডা করত।

একদিন অজয় একটি নূতন হাঁড়ির মুখ উত্তমরূপে বেঁধে, অতি গোপনে সেটিকে একটা নির্জ্জন ঘরের কোণে রেখে, একছড়া সোনার হার মেয়েটিকে দেখিয়ে বললে,—দেখ, কি চমৎকার হার,—এই হারের লোভ সামলাতে না পেরে, একটা ছেলেকে খুন ক'রে তার গলা থেকে এই হার খুলে নিয়েছি। পাছে ধরা পড়ি সেই ভয়ে, ছেলেটাকে কেটে খণ্ড খণ্ড ক'রে হাঁড়িতে পুরে ঐ খালি ঘরে রেখে দিয়েছি। এখন কি উপায় করি বল্ দেখি পুঁটি ?

পুঁটি ভয়ে চীৎকার করতে যাচ্ছিল অজয় তাহাতে বাধা দিয়ে বললে,—চুপ্ চুপ্! চেঁচালেই সর্ব্বনাশ! সব জানাজানি হ'য়ে যাবে! কোটাল জান্‌তে

পার্‌লে এখনই বাড়ি ঘেরাও ক'রে সবাইকে বেঁধে চালান দেবে,—তখন প্রাণ বাঁচান ভার হবে।

পুঁটি ছুটে তার মা-বাপকে গিয়ে জানালে, ব্রাহ্মণ নিজেদের বাঁচাবার জন্য ছুটে কোটালখানায় সংবাদ দিলেন। নগর কোটালের কর্ণে সে খুনের কথা প্রবেশ করবামাত্র অজয়কে খুনের আসামী করে হাজতে পুর্‌লেন। ইহার পর রাজার বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হ'ল।

ফাঁসির দিন উপস্থিত। বধ্যভূমি জনাকীর্ণ; তিল ধারণের স্থান নাই। নগর কোটাল এবং তৎপ্রমুখ দেহরক্ষী বেষ্টিত হ'য়ে, রাজা ও জমিদার-বন্ধু একত্রে আসীন। পশ্চাতে পর্দ্দার অন্তরালে রাজমহিষী, জমিদারপত্নী ও অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। এমন সময়ে খুনী আসামী অজয় রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় বধ্যভূমিতে আনীত হ'ল। অজয় স্থির,—ধীর,—গম্ভীর! দুঃখের লেশ মাত্র নাই। অজয়ের সরল ও সুন্দর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সহসা রাজার ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন,—এই যে সম্মুখে সৌম্যমূর্ত্তি যুবক দণ্ডায়মান রয়েছে সত্যই কি এ দোষী? ইহার মুখশ্রী ও হাব-ভাব দেখলে, ইহাকে নির্দ্দোষ বলেই অনুমান হয়। কেননা যার মাথার শিয়রে কালান্তক ফাঁসির রজ্জু ঝুলছে, ক্ষণকাল পরেই যার মৃত্যু নিশ্চিত, ইহা স্বচক্ষে দেখেও যে নিশ্চিন্ত চিত্তে কালযাপন করতে পারে, সে কি কখন দোষী হতে পারে? কখনই নয়।

এইরূপ নানা চিন্তায় রাজার অন্তর দোদুল্যমান হতে লাগল। সহসা জমিদারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হলেন, দেখলেন, বন্ধুর বদনমণ্ডল বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন,—ঘন ঘন শ্বাস বইছে, নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত। রাজার কৌতূহল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, এ যুবককে বন্ধুর বিশেষ আত্মীয় ব'লে

মনে হ'ল, বললেন,—বন্ধু এত দুঃখিত হবার কারণ কি? তবে কি এ যুবক তোমার পরিচিত?

জমিদার অতিকষ্টে অশ্রু সম্বরণ ক'রে বললেন,—হাঁ বন্ধু, পরিচিত ত বটেই, তা ভিন্ন এ যুবকের অদৃষ্টলিপির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উভয়ের অদৃষ্ট জড়িত।

কেন কিসের জন্য? এ যুবক আমাদের কে?

তবে শুন বন্ধু। এ যুবক আমার পুত্র স্থানীয়। দশ বৎসর বয়সে নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল, তুলে ঘরে নি, নিজের ছেলের মতন লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলি। বন্ধু, ওর আশ্চর্য্য গুণের পরিচয় কি দিব, জমিদারি চালনায় অনেক জটিল বিষয় মীমাংসা করতে ঐ যুবক আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। মনে পড়ে কি, দুই মাস পূর্ব্বে, তুমি তোমার স্ত্রীর দুটি প্রশ্নের উত্তরে অস্থির হয়েছিলে। তোমায় শান্ত করতে গিয়ে, উত্তরের মীমাংসার ভার নিয়ে আমিও যে কি মহা বিপদে পড়েছিলাম তা বলবার নয়। অজয় উত্তর দিতে পারবে বলায়, অনেক আশা ক'রে ওকে বিদেশে পাঠিয়েছিলাম; ভেবেছিলাম ও নিশ্চয় আমাদের মানরক্ষা করবে, কিন্তু সব বিপরীত হ'ল,—খুনী অপরাধে দণ্ডিত হ'য়ে নিজেও ম'ল আমাদেরও মজালে। এর পরিণাম ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে! সমস্ত রক্ত জল হ'য়ে যায়! মৃত্যু! মৃত্যু! কি পরিতাপ! ব্রহ্মাণ্ডদেব! রক্ষা কর প্রভু রক্ষা কর!

জমিদারের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হ'ল না; উর্দ্ধদিকে মুখ ক'রে অশ্রুতে বক্ষ প্লাবিত করতে লাগলেন।

রাজা, তাঁর প্রতি জমিদারের অকৃত্রিম ভালবাসা এবং তাঁরই বিপদে বন্ধুকে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত দেখে সান্ত্বনা করতে যত্নবান হ'লেন, বললেন,—বন্ধু, স্থির হও! বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এতটা উদ্বিগ্ন হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অজয় বড় সামান্য ছেলে নয়, তা' তা'র পরিচয়েই বুঝেছি। সে যখন

স্বেচ্ছায় উত্তর দিবার ভার নিয়েছে, তখন সে না বুঝে নেয়নি,—সে যে নিশ্চয়ই জয়ী হ'বে তা' তা'র মুখের ভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে।

অজয়কে খুনের আসামী ক'রে

রাজা অজয়কে নিকটে ডেকে স্নেহস্বরে বললেন,—আমার প্রথম প্রশ্ন,—'গোড়ায় গলদ' ইহার সপ্রমাণ উত্তর কি কিছু পেয়েছ বাবা?

অজয় রাজাকে অভিবাদন ক'রে বলল,—হাঁ মহারাজ, আপনার আশীর্ব্বাদে কিছু কিছু পেয়েছি।

কি পেয়েছ বল?

অজয় সহাস্যবদনে বলতে লাগল,—মহারাজ, আমার পিতৃতুল্য ঐ আশ্রয়দাতা জমিদারের মুখে আপনার কথিত প্রশ্ন শুনে, অভিসন্ধি এঁটে উঁহার অনুমতি ক্রমে বাড়ি থেকে বেরুলাম। তারপর আপনার এই মহানগরীতে এক ব্রাহ্মণ বাড়িতে বাস করতে লাগলাম। কিছুদিন গত হ'লে সোনার হারের লোভে একদিন একটা ছেলেকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটলাম। পরে একটা নূতন হাঁড়িতে পুরে, তার মুখ উত্তমরূপে বেঁধে বাড়ির মধ্যে একটা খালি ঘরের কোণে রেখে চুপে চুপে পুঁটিকে ডাকলাম, বললাম,—তোর জন্যে একটা ছেলেকে কেটে, সোনার হার, এনেছি, ঐ দেখ্ সেই ছেলে,—ব'লে হাঁড়ি দেখালাম। পুঁটি ভয়ে চীৎকার করবার উপক্রম করলে, আমি মুখ চেপে ধ'রে বললাম,—চুপ্। চুপ্! গোল করিস্ নি। কোটাল জান্‌তে পারলে বাড়ীশুদ্ধ সকলকে বেঁধে চালান দেবে। কিন্তু পুঁটি তা' শুনলে না, মা-বাপকে জানিয়ে দেওয়াতে আমি ধরা পড়ে গেলাম।

মহারাজ, 'গোড়ায় গলদ' সম্বন্ধে এই বলতে চাই যে, কোটাল মহাশয় বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হয়েও এমন ভুল করেছেন যে, যে ভুলের জন্য একজন নিরীহ ব্যক্তি হাজত বাস ক'রে কি কষ্টই না ভোগ করলে।

রাজা ও রাণী উভয়েই চমকিত হলেন, বললেন,—কি বললে! কি বললে! নিরীহের প্রতি অত্যাচার! একি কথা তোমার? আমরা ত কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

যথাযোগ্য সম্ভ্রম সহকারে অজয় বললে,—এই ত সম্মুখে কোটাল মহাশয়

এ বক আমার পুত্র স্থানীয়

রয়েছেন উঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন উনি ব্রাহ্মণের কথায় আমায় খুনি সাব্যস্ত ক'রেছেন কি না ?

নগর কোটাল ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে বললেন,—খবরদার! মুখ সাম্‌লে কথা ক! খুনি,—বদ্‌মাস্! খুন ক'রে আবার মস্করা করা হচ্ছে! এখনি চাবুকে লাল ক'রে দোবো জানিস্!

চোখ রাঙানিতে কিছুমাত্র ভীত না হ'য়ে অজয় সতেজ উত্তরে বললে,—মহাশয় গো,—হাঁড়িটার ভেতর সাপ, বেঙ, কি, আর কিছু আছে তা পরীক্ষা করেছেন কি?

অহঙ্কারে প্রমত্ত নগর কোটালের মুখের উপর নগণ্য অজয়ের সতেজ উত্তরে সিংহনাদ সহকারে তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে কোটাল আসন ছেড়ে অজয়কে প্রহার করতে উদ্যত হলেন; কিন্তু পরক্ষণেই চমক ভেঙ্গে অধোমুখে বসে পড়লেন।

নগর কোটালের এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখে রাজা ও রাণীর কৌতূহল অত্যন্ত বৃদ্ধি হ'ল, রাজা অজয়কে পুত্রবৎ স্নেহের স্বরে বললেন,—হাঁড়িটা পরীক্ষা কর্‌লে কি দেখত?

মহারাজ, আমি খুনি আসামী, আমার কথা বিশ্বাস হ'বে কি? আমায় জিজ্ঞেস্ কর্‌বার পূর্ব্বে কোটাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর্‌লে ভাল হয় না কি?

রাজা, নগর কোটালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেখলেন, কোটালের মুখ পাংশু-মূর্ত্তি ধারণ করেছে একটিও বাঙনিষ্পত্তি হচ্ছে না। রাজা কোটালকে নিরস্ত থাকতে দেখে দৃঢ়স্বরে বললেন,—তুমি হাঁড়ির মধ্যে কি দেখেছ, ঠিক ক'রে বল?

কোটাল অধোবদনে বললেন,—আমি হাঁড়ির ভেতর কি আছে দেখি নাই,—ঐটি আমার বড় ভুল হয়েছে।

একজন প্রবীন ও বুদ্ধিমান্ নগর কোটালের এত বড় একটা ভ্রম দেখে রাজা সাতিশয় আশ্চর্যান্বিত হলেন, ভর্ৎসনাসূচক স্বরে বললেন,—বলছ কি? তোমার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে? কোটালগিরি ক'রে বুড়ো হ'য়ে মরতে বসেছ

তবু এ বুদ্ধিটা এল না যে, হাঁড়িটা একবার দেখি। দেখ, তোমার ভুলে একজন নিরীহ ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রাণটা এখনই যেতে বসেছিল,—ছিঃ!

ইহার পর অজয়ের দিকে মুখ ক'রে রাজা আহ্লাদে বললেন,—বলিহারি বুদ্ধি! এমন যে নগর কোটাল, যা'র বুদ্ধির ভেতর ঢুকতে বড় বড় চোর ডাকাত, ফেরারি, আসামী হার মেনে যায়, তাকেও হার মানিয়েছ!—ও যে নিজে একটা মস্ত বুদ্ধিমান ব'লে গর্ব্ব করত সে গর্ব্ব খর্ব্ব করেছ, তারও গলদ বা'র করেছ। বেশ বুঝিয়েছ, কেহ যেন অভ্রান্ত ব'লে গর্ব্ব না করে। ধন্য অজয়! তোমায় শত শত ধন্য! আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন 'গোড়ায় গলদ' এর উত্তর কড়ায় গণ্ডায় দিয়েছ; আমি ত সন্তুষ্ট হয়েছিই, তোমার রাণীমাও সন্তুষ্ট হ'য়েছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্চে,—'অভিষিক্ত গর্দ্দভ। সেটা কে?

রাজা, কৌতূহল বশতঃ উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন।

অজয়, কৃতাঞ্জলিপুটে রাজা ও তাঁর পূর্ব্বপুরুষদিগের স্তুতিগান ক'রে রাজাকে পরম তুষ্ট করলেন, শেষে বললেন,—আপনি হেন বিদ্বান্ ও সদ্‌বিবেচক রাজা যখন পিতৃ রাজ্যে অভিষিক্ত হ'য়েছেন, তখন আপনার বুদ্ধি, বিবেচনা ও ন্যায়পরতার পরিচয় অধিক কি দিব। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আপনিও নগর কোটালের ন্যায় ভুল ক'রে বসেছেন, আমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে হাঁড়িটার মধ্যে কি আছে না আছে তা' দেখতে বিস্মৃত হয়েছেন। অতএব কোটাল মহাশয়ের কথা প্রমাণে আমায় ফাঁসির আজ্ঞা দিয়ে গর্দ্দভের মত কাজ করেন নাই কি? এজন্য আপনাকে 'অভিষিক্ত গর্দ্দভ' ভিন্ন আর কি বলা যেতে পারে?

অজয়ের অসাধারণ বুদ্ধির প্রখর্য্য দেখে, রাজার ক্রোধের সঞ্চার হওয়া দূরে থাকুক বরং তিনি হর্ষোৎফুল্ল হলেন এবং মহিষীর সহিত পরামর্শ ক'রে তার দণ্ড মকুব

করলেন, পরীক্ষার জন্য রাজা হাঁড়িটাকে সর্ব্বসমক্ষে আনালেন। ঢাকা খুলে দেখলেন, তাহার মধ্যে ইট পাটকেলের সঙ্গে একটা কঙ্কাল রয়েছে, সেটা মানুষের নহে বিড়ালের। তখন অজয়ের উপর সকলের প্রাণ শ্রদ্ধায় ভরে উঠল, এবং চতুর্দ্দিক হ'তে অসংখ্য কণ্ঠে তার অদ্ভুত বুদ্ধির জয়ঘোষণা হ'তে লাগল। তৎপরে মহিষীর অনুমতিক্রমে রাজা অজয়কে প্রচুর অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করলেন, এবং পরম বন্ধু জমিদার ও তৎ পত্নীর একান্ত আগ্রহে তাঁদের একমাত্র কন্যা মধুমালতীর সহিত অজয়ের বিবাহের ব্যবস্থা ক'রে সভা ভঙ্গ করলেন।
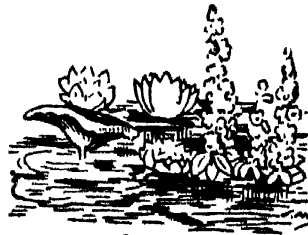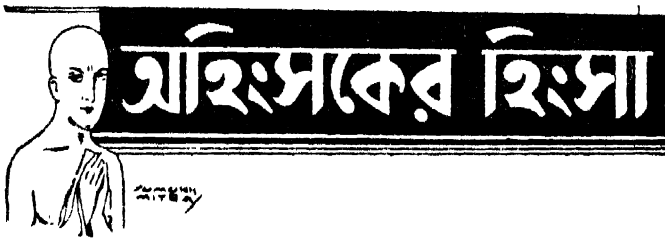
সে আজ অনেকদিনের কথা। কোশলের রাজা প্রসেনজিতের এক পুরোহিত ছিলেন—নাম ভার্গব। রাজা তাঁকে খুব ভালবাসতেন, আর ভক্তি করতেন। কেননা, ভার্গব ছিলেন সত্যিকারের পুরোহিত, পুরের অর্থাৎ রাজ্যের এবং রাজার মঙ্গলের জন্য, যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এমন কি তিনি একদিন তাঁর সদ্যজাত প্রথম পুত্র-সন্তানকেও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বধ করতে চেয়েছিলেন।

ভার্গবের যেদিন প্রথম পুত্র-সন্তান জন্মে,—সেইদিন, রাজধানীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র থেকে অগ্নিশিখা বেরিয়েছিল। দৈবজ্ঞরা বললেন,—এই শিশু একজন ভয়ানক দস্যু হবে। যার দ্বারা রাজ্যের অনিষ্ট হবে,—তার মৃত্যুই কাম্য। ভার্গব স্থির করলেন, তিনি পুত্রের প্রাণনাশ করবেন। রাজার কানে সে কথা গেল।

রাজা তাঁকে ডেকে বললেন,—দেব, মানুষ মাত্রেই ভুল করে, দৈবজ্ঞরা ত মানুষ, গণনায় তাঁদের ত ভুল হ'তে পারে? আর বাস্তবিকই যদি এই শিশু কালে দস্যু হয়,—তা'হলে রাজশক্তি তাকে দমন করতে পারবে না কি? যে রাজশক্তি একটা দস্যুকে দমন করতে না পারবে, তেমন রাজশক্তি কখন পৃথিবীতে স্থায়ী

হয় না। তাই বলছি, আপনি ভুলের মোহে আপনার প্রথম সন্তানকে হত্যা ক'রে পাপের পরিচয় দেবেন না।

ভার্গবের স্ত্রী মানবিকা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা জানালেন,—হে ভগবান, আমার এ নয়নমণিকে ভবিষ্যতের কলঙ্ক হ'তে বাঁচিয়ে রেখ,—তাকে অহিংসকরূপে গ'ড়ে তোল। আমি তার নাম রাখলাম "অহিংসক"—এ নাম যেন সার্থক হয়।

পঞ্চম বৎসরে অহিংসকের হাতেখড়ি হ'ল। মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তক্ষশিলায় গুরুগৃহে গেল। অহিংসকের এমনি বুদ্ধি ও অধ্যবসায় যে,—কোন ছেলেই পাঠে তা'র সমান হ'তে পারলে না। সামান্য একটা ছেলে এত শীঘ্র পণ্ডিত হ'য়ে উঠবে—একি কারুর সহ্য হয়।

অধ্যাপকের একটি দোষ ছিল,—তিনি সুরাপান করতেন,—অবশ্য লুকিয়ে। কেননা, রাজার কানে যদি একথা ওঠে,—তা'হলে রাজবৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে। সেকালে নিয়ম ছিল,—অধ্যাপকের হবে নির্ম্মল চরিত্র, নতুবা রাজবৃত্তি দেওয়া হবে না। সমস্ত ছেলেরা অধ্যাপককে বললেন,—দেব, আপনার সুরাপানের কথা অহিংসক জানতে পেরেছে,—এবং সে বলেছে, এ বিষয়ে সে রাজার গোচরে আনবেন। অধ্যাপক প্রমাদ গণলেন—অযথা ঝগড়া করে তাকে তাড়ালে, বিপদ আরও বাড়বে। বিশেষতঃ রাজপুরোহিতের পুত্র। হাঁ, কৌশলে, কৌশলেই তাকে তাড়াতে হবে।

একদিন অধ্যাপক অহিংসককে বললেন,—অহিংসক, এখান থেকে গৃহে না ফিরে যদি তুমি এক হাজার লোকের প্রাণবধ ক'রে, প্রত্যেকের এক একটি আঙুল এনে আমায় দেখাতে পার, তা'হলে তোমায় এমন এক বিদ্যা দান করব, যা এ পর্য্যন্ত আমি কা'কেও দিই নি।

অহিংসক সরল প্রাণে স্বীকার করল। সে জানে, অধ্যাপকের অবাধ্য হ'লে বিদ্যা শিক্ষা হয় না। আর তা ছাড়া, এ নিশ্চয় এমন এক বিদ্যা, যা শিখতে গেলে সহস্র লোকের প্রাণবধ করা চাইই চাই।

অহিংসক গৃহে না ফিরে এক বনে গিয়ে রইল। ঐ বনের ভিতর আটটি রাজ পথ এসে মিশেছে। তাই প্রথম প্রথম বধের জন্য লোকের অভাব ঘটত না। কিন্তু যতই দিন যায়, ততই লোকের যাওয়া আসা কমতে লাগল। কিন্তু কেহই তা'র আসল নাম জানতে পারলে না।

এক হাজার লোকের প্রাণ বধ ক'রে

অহিংসকের অত্যাচারে কোশলরাজ্য সন্ত্রস্ত। প্রসেনজিৎ নিজে সসৈন্যে গিয়ে তাকে বধ করবার জন্য ইচ্ছা করলেন। গুপ্তচর এসে খবর দিল—এ দস্যু আর কেহ নহে, স্বয়ং অহিংসক—রাজপুরোহিত ভার্গবের পুত্র। ভার্গব পুত্রের জন্য কোন চেষ্টাই করলেন না। ভাবলেন, আমি গেলে আমাকেও বধ করবে। কিন্তু মায়ের প্রাণ স্থির থাকতে পারল না। রাজশক্তির কবল থেকে পুত্রকে বাঁচাবার জন্য তিনি নিজেই যাবেন স্থির করলেন।

রাজা কাল সকালে সসৈন্যে দস্যুদমনে বেরুবেন—একথা চারদিকে ঘোষণা করা হ'ল। শুনে মা সেই দিনই গভীর রাত্রে বনের মধ্যে ছুটে চললেন—বনের নিস্তব্ধতাকে কাঁদিয়ে তিনি কাতরস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন,—অহিংসক! অহিংসক! শুধু প্রতিধ্বনি তাঁর কাতর আহ্বান অনুকরণ করল,—পাগলিনীর মত চিৎকারই কেবল সার হ'ল। ক্রমাগত চিৎকারে তাঁর স্বর ভেঙে গেল, তবু অহিংসকের দেখা নাই। ভগবান! আমার নয়নমণিকে রক্ষা ক'র! এই ব'লে মাতা মানবিকা অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন।

জ্ঞান যখন ফিরল—তখন দেখলেন, সম্মুখে সৌম্য মূর্ত্তি এক ভিক্ষু। ভিক্ষু বললেন,—মা, তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমায় গৃহে রেখে আসি। মানবিকা বললেন,—না প্রভু, আমি ঘরে ফিরব না, আমি যেতে চাই, এই বনের দস্যুর কাছে। আমায় পথ ব'লে দিন।

ভিক্ষু বললেন,—কেন মা, কি দুঃখে সেই দস্যুর হাতে প্রাণ হারাবে?

সে দস্যু যে আমারই পুত্র!—আমার নয়নমণি! তাকে বাঁচাব রাজার হাত থেকে! রাজা আমার পুত্রকে বধ করবার জন্য সসৈন্যে কাল আসছেন! পুত্র আমার একা, এতগুলি সৈন্যের সঙ্গে কখনও সে পেরে উঠবে না।

ভিক্ষু মানবিকাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—ভয় নেই মা, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই, দেখি আমরা দুজনে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি কি না?

মানবিকা বললেন,—না প্রভু, আপনি যাবেন না, এখন সে পশু আপনাকে সে হয় ত বধ করবে। কেননা শুনেছি, কোন ভিক্ষুও তার কাছ থেকে নিস্তার পায় নি। আমি একা যাব। আমি তার মা,—ছেলের কোন লাঞ্ছনাই আমায় দুঃখ দেবে না,—তাই বলছি প্রভু আপনি ফিরুন।

ভিক্ষুর মুখে হাসি ফুটে উঠল,—মা! আমি শ্রমণ আমার কথা ভেবে

আকুল হবেন না। সংসারের মায়ামুক্ত আমি। পরার্থে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া শ্রমণের কর্ত্তব্য,—দধীচি মুনির কথা ত জান মা।

মানবিকা বললেন,—ভগবন্,—শ্রমণবেশী স্বয়ং ভগবান্ আপনি। আমার মনে আশা হচ্ছে, আপনার চরণস্পর্শে আমার পুত্র উদ্ধার হবে।

ভিক্ষু অগ্রসর হতে লাগলেন, পশ্চাতে মাতা করযোড়ে অনুগমন করলেন। কিছুদূর গমনের পর, উপর থেকে কে যেন চিৎকার ক'রে বলল,—কে যায়, স্থির হও! কথা শেষ হ'তে না হ'তেই গাছ থেকে ঝুপ ক'রে নামল একটি বলিষ্ঠ বালক। অহিংসক!

তুমি যেখানে আছ সেইখানে থাক

অহিংসক! ব'লে ছুটে গিয়ে মানবিকা পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। অশ্রুর বান ছুটল। কয়েক ফোঁটা তার বুকে পড়ল—অহিংসক কাঁপতে লাগল, একটি নরহত্যা করা এখনও বাকি, তার এতদিনকার সাধনা নিষ্ফল হবে? অহিংসক প্রবল উত্তেজনায় মায়ের আলিঙ্গনপাশ মুক্ত ক'রে, ভিক্ষুকে বললে,—শ্রমণ! তুমি

প্রস্তুত হও! আমি তোমায় বধ করব! ব'লে অহিংসক তরবারি হস্তে বেগে ভিক্ষুর দিকে অগ্রসর হ'ল।

ভিক্ষু বললেন তুমি যেখানে, আছ, সেইখানে থাক, আমার দিকে এগিও, না। অহিংসক মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় থেমে গেল। মনে হ'ল, তার সমস্ত শক্তি যেন বিলীন হ'য়ে গিয়েছে,—অহিংসক একবার ভিক্ষুর দিকে, আর একবার ক্রন্দনশীল মাতার দিকে চেয়ে রইল।

ভিক্ষু বললেন—বৎস, তুমি কেন নরহত্যা করছ ?

অহিংসক বললে—অধ্যাপকের আদেশ। নতুবা বিদ্যাদান করবেন না।

ভিক্ষু অহিংসকের কাঁধে হাত রেখে বললেন—ভুল, বৎস, ভুল। হিংসা সাধন দ্বারা কখনও বিদ্যা অর্জ্জন হয় না। ভাগ্যদোষে তুমি হিংস্র অধ্যাপকের কাছে বিদ্যা অর্জ্জন করতে গিয়েছিলে,—সে তাই নিজের স্বার্থের জন্য, তোমার প্রাণনাশ করবার জন্য মিথ্যা স্তোকবাক্যে তোমায় হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়েছে।

অহিংসক দুই কানে আঙুল দিয়া বললে—না, না, আপনি গুরুনিন্দা করবেন না, গুরুনিন্দা শোনা পাপ।

ভিক্ষু বললেন—বেশ বৎস, তাই হোক্। গুরুনিন্দা আমি করব না। দেখছি তোমার অন্তরের আলো এখনও নেবেনি,—এস আমার আশ্রমে, আমি তোমায় বিদ্যা দান করব,—বিদ্যা তোমায় দান করবে জ্ঞান,—জ্ঞান তোমায় জানিয়ে দেবে হিংসা বড় না অহিংসা বড়।

অহিংসক বললে—বেশ, প্রথমে আমায় বলুন, কেন আমি আপনাকে হত্যা করতে পারলাম না,—কেন আমার হাত অবশ হ'য়ে এল।

ভিক্ষু বললেন—সে অহিংসার শক্তি। যেদিন অহিংসক হবে,—সেদিন তুমিও হবে শক্তিশালী আর বাক্‌সিদ্ধ। এস, তুমি মায়ের অনুমতি নিয়ে আমার আশ্রমে।

মানবিকা পুত্রের এরূপ পরিবর্ত্তনে আনন্দে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। অহিংসককে বুকে জড়িয়ে চুমু খেলেন। অহিংসক চলল ভিক্ষুর আশ্রমে।

পরদিন প্রাতে কোশলরাজ বনে এলেন,—তন্ন তন্ন করে অহিংসককে খুঁজলেন—কিন্তু তাহার কোন নির্দ্দেশ পেলেন না।

তবে সেই পুণ্যফলে এ রোগী নিরাময় হউক

এদিকে আশ্রমে অহিংসক বিদ্যা অর্জ্জন করতে লাগল। বিদ্যায় তার বুদ্ধি নির্ম্মল হ'ল। সে বুঝল অহিংসায় মানুষ কত শক্তিলাভ করে,—পাশব শক্তি কেন অহিংসার কাছে তুচ্ছ। সে এক নূতন আলোর সন্ধান পেলে,—সে আলোয় তার দস্যু-জীবনের সমস্ত কালিমা স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। অহিংসক সকলের চেয়ে নিজেকে ছোট ক'রে দেখতে লাগল।

একদিন অহিংসক ভিক্ষায় বেরুল। সে যে-বাড়িতেই ভিক্ষা চাইতে যায়—তারা সকলেই ভয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে আশ্রমে ফেরবার পথে একবার শেষ চেষ্টার মত সে এক গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা চাইল। একটি ঝি এসে বললে—এখন ভিক্ষা মিলবে না—কেননা, গৃহস্থের একমাত্র সন্তান আজ মর, মর।

অহিংসক শূন্যপাত্রে আশ্রমে ফিরলেন,—ভিক্ষুকে সকল কথা জানালেন।—ভিক্ষু বললেন,—অহিংসক, তুমি সেই গৃহস্থের বাড়িতে আবার যাও—গিয়ে রোগীর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে বলবে—আমি জন্মাবধি ইচ্ছা ক'রে প্রাণিহিংসা যদি না ক'রে থাকি—তবে সেই পুণ্যফলে এ রোগী নিরাময় হোক্। অহিংসক বললে,—সে কি কথা, প্রভু। আমি যে শত শত লোকের প্রাণবধ করেছি।

করেছিলে বটে—কিন্তু তখন তুমি ছিলে আর এক মানুষ—এখন ভিক্ষু সঙ্ঘে এসে নবজীবন লাভ করেছ। তুমি যাও—তোমার পরীক্ষা ত এইখানেই।

অহিংসক সেই গৃহস্থের বাড়িতে গেলেন। রোগীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে বললে—ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও যদি প্রাণিহিংসা না ক'রে থাকি—তবে, রোগী নিরাময় হোক্। সঙ্গে সঙ্গে মৃতপ্রায় রোগী বিছানায় উঠে বসল—সে যেন সুস্থদেহে একটু আগে ঘুমিয়ে ছিল—এখন ঘুম থেকে উঠল। অহিংসক নিজেই অবাক্ হ'য়ে গেল। একি তার মত পাপীর পক্ষে সম্ভব? না—এ গুরুর কৃপা! অহিংসক ভাবতে ভাবতে আশ্রমে এল।

ভিক্ষু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—অহিংসক, আশ্চর্য্য হ'য়ো না। এ সবই সম্ভব। অহিংসা সাধনায় সবই সম্ভব। এখন তোমার পুর্নজন্ম হয়েছে। আজ তোমার মায়ের প্রদত্ত অহিংসক নাম সার্থক হ'য়েছে—আজ তুমি প্রকৃতই অহিংসক।

রং-কাণা

মায়ের জন্মদিন উপলক্ষে জন ড্যালটন নামে একজন বিখ্যাত রাসায়নিক একজোড়া রেশমের মোজা মাকে উপহার দিয়েছিলেন। মা বেশ খুশি হ'য়ে বললেন—বাঃ, বেশ মোজা; কিন্তু, জন্, এত টকটকে ঘোর রং পছন্দ করলে কেন? তুমি ত জান, আমি ঘোর রং মোটেই পছন্দ করি না।

ছেলে মনে করলেন, মায়ের নিশ্চয়ই চোখ খারাপ হয়েছে। এই নিয়ে মায়ে ও ছেলে তর্ক বাঁধে। শেষে প্রতিবেশীরা যখন বললে, মোজার রং বাস্তবিকই ঘোর লাল—তখন ছেলের হুঁস হ'ল। তাঁর চোখে মোজার রং দেখাচ্ছিল কালচে। এই ছেলেটি তখন যথেষ্ট গবেষণা ক'রে বুঝতে পারলেন যে, লাল রং তাঁর চোখে ধরা পড়ে না,—সেইজন্য যে সমস্ত রঙে লালের অংশ আছে, সেই সমস্ত রং সাধারণ লোকের থেকে সে পৃথক দেখে।

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক,—হলদে রঙে লাল ও সবুজের অংশ আছে। যে রং-কাণা, সে হলদের মধ্যে লাল অংশটা দেখতে পায় না, কাজেই হলদে রংকে সে সবুজ বলবে। গোলাপী রঙে লাল ও নীলের অংশ আছে, রং-কাণা যেহেতু লাল অংশ দেখতে পায় না, সেই হেতু গোলাপীকে নীল বলবে। ঘোর লাল রং-কাণারা মোটেই দেখতে পায় না, সেইজন্য তারা ঘোর লাল রংকে কাল বলবে। কাল—কোন রং নয়, কেননা যেখানে আলো নেই, সেইখানে অন্ধকার, আর এই অন্ধকারই হচ্ছে—কাল।

তবে কি আলোর সঙ্গে রঙের কোন সম্বন্ধ আছে? নিশ্চয়ই আছে। সূর্য্যকিরণ সাদা,—কিন্তু এই সূর্য্যকিরণে সাতটা রং আছে—সে সাতটা রং তোমরা রামধনুতে দেখতে পাও।

তোমরা বোধ হয় জান,—এই বিশ্ব জগৎ ব্যেপে ঈথর নামে এক বস্তু আছে। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা ইহা অনুভব করতে পারি না। কিন্তু ইহা যে আছে, তার প্রমাণ আমরা পাই,—যখন চুম্বক লোহাকে টানে, যখন তোমার হাত থেকে বই-শ্লেট মাটিতে পড়ে, যখন আয়নার সাহায্যে সূর্য্যকিরণ অন্য কোন জায়গা আলোকিত কর, এমনি কত উদাহরণ দেওয়া যায়। মোটকথা ঈথর ব'লে একটা পদার্থ এই বিশ্বব্যাপিয়া আছে,—তা আমাদের মেনে নিতে হবে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—বাতাসে ঢেউ তুললে যেমন শব্দের সৃষ্টি হয়, তেমনি এই ঈথর সমুদ্রে ঢেউ তুললে, আলোর সৃষ্টি হয়। ঈথর সমুদ্রে সব ঢেউ সমান নয়, এক এক প্রকারের ঢেউতে এক এক প্রকার জিনিসের উৎপত্তি হ'তে পারে। যেমন ঈথর-সমুদ্রে এমন এক প্রকার ঢেউ হয়, যে ঢেউ আমাদের চোখে লাল রঙের অনুভূতি জন্মায়, অর্থাৎ ঢেউএর তারতম্য অনুসারে হলদে, সবুজ, লাল, সবজে নীল, কমলা, নীল প্রভৃতি রামধনুর সাতটি রঙের অনুভূতি আমাদের চোখে জন্মায়। তা হ'লে তোমরা বুঝতে পারলে রং বলিয়া জগতে কিছু নাই,—আছে ঈথর তরঙ্গ। সেই ঈথর তরঙ্গ মানুষের চোখে রঙের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। তাই যে রং-কানা তার লালের অনুভূতি নাই ব'লে, সাধারণ লোক থেকে তার রঙের অনুভূতি আলাদা।

পুস্তক তালিকা
পরপৃষ্ঠায় দেখুন

卐

শিশু-সাহিত্যে নামকরা ক'খানা বই

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী

বল তো

ধাঁধার বই। চোখের ধাঁধা, শব্দের ধাঁধা, হেঁয়ালি, সমস্যা প্রভৃতির বই। এ ধরণের বই শিশুসাহিত্যে এই প্রথম। ছেলেরা, বড়রা এ বই পড়ে বেশ আনন্দ পাবে—ধাঁধার ছবিও আছে। **দাম দশ আনা**

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

গল্পঠাকুরদা

তোমাদের কত বন্ধুবান্ধব নাওয়া, খাওয়া, পড়াশুনার মধ্যে কেমন সব মজার মজার গল্প গড়ে তুলে, তা হয় ত তোমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু "গল্পঠাকুরদার মুখে" সেগুলো শুন্‌লে অবাক্ হবে? ভাববে—তাই ত! নূতন বই।

দাম ছয় আনা

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত

পরীর গল্প

রূপ কথার গল্প। প্রত্যেকটি গল্প মধুময়। তোমাদের মনকে ধীরে ধীরে বাস্তব থেকে কল্পলোকে নিয়ে যাবে—ভুলে যাবে তুমি গল্প পড়ছ। মনে হবে তুমিই যেন গল্পের নায়ক।

দাম ছয় আনা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
ও
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

জীবনের সাফল্য

মণ্টুর মাষ্টারের মতই তেমনি চমৎকার, তেমনি মজার সব হাসির গল্প। তেমনি প্রকাণ্ড বই, পাতায় পাতায় ছবি, শিবরামবাবুর সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছেন, গৌরাঙ্গবাবু, অল্পদিনেই হাসির গল্প লিখে নাম কিনেছেন যিনি। **দাম ছয় আনা**

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

অঞ্জলি

গোষ্ঠবাবুর অন্যান্য বইয়ের মতই এ বইখানাও শিক্ষাপ্রদ গল্পাঞ্জলি। প্রত্যেকটি গল্প যেন হীরের টুকরো। **দাম ছয় আনা**

শিশু-সাহিত্যে নামকরা ক'খানা বই

শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

বেজায় হাসি

হাসির কবিতা আর কার্টুন ছবি। শিশু-সাহিত্যে এমন বই এই প্রথম। দ্বিতীয় সংস্করণ।

দাম পাঁচ আনা

❁ ❁ ❁

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

নীতিগল্পগুচ্ছ

পারস্য কবি শেখ শাদীর অসংখ্য নীতি-গল্পের সাজি—ফুলের মত সৌরভময়—কত ছবি কত গল্প। চতুর্থ সংস্করণ। দাম ছয় আনা

❁ ❁ ❁

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

জাতকের গল্পমঞ্জুষা

গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম ও জীবন-কথা যে বইতে আছে—তাকে "জাতক" বলে। জাতকের অনেক ভাল ভাল গল্পের সঞ্চয়নই হচ্ছে—**জাতকের গল্পমঞ্জুষা**। তোমাদের পড়া খুবই উচিত। দাম ছয় আনা

❁ ❁ ❁

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

গল্পবীথি

কয়েকটি সরস গল্পের সাজি। কল্পনায়, মাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে লালিত্যময়।

দ্বিতীয় সংস্করণ দাম ছয় আনা

❁ ❁ ❁

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

শিশু-সারথি

যে জিনিস তুমি দেখতে পাচ্ছ না, অথচ যার অস্তিত্ব মেনে নাও—এমন জিনিসের কথা জানতে কি ইচ্ছা হয়? তবে কিনে ফেল।

দাম ছয় আনা

❁ ❁ ❁

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত

মায়াপুরীর ভূত

ভয়ের বদলে হাসির ফল্গুধারা প্রতি ছত্রে ছত্রে।

২য় সংস্করণ। দাম ছয় আনা

❁ ❁ ❁

শিশু-সাহিত্যে নামকরা ক'খানা বই

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

[illegible] দেশে অমলা

বাংলায় Alice in Wonderland. একে ত বইখানি আশ্চর্য্য ঘটনার পর ঘটনায় পরিপূর্ণ—তা'তে হেমেন বাবুর লেখার যাদু এর [illegible] ছত্রে ছত্রে মিশে আছে। কাহিনী আরও [illegible] শীঘ্রই বেরুবে।

[illegible] আট আনা

[illegible]

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

মণ্টুর মাষ্টার

❂ ❂ ❂

সামায়িক পত্রিকায় শিবরাম [illegible] সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে। [illegible] হাসি যাতে আছে, এমন সব গল্প বেছে [illegible] এই বইখানি বের করা হল। হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে গেলে শিবরাম বাবু কিন্তু দায়ী নহেন। **দাম ছয় আনা**

শ্রীযোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনার পাহাড়

❂ ❂ ❂

এ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী। কি কি ভয়াবহ বিপদে ছুটি বাঙালী ছেলেকে পড়তে হয়েছিল—শক্তি ও সাহসের দ্বারা কি ভাবে বিপদ কাটিয়ে উঠেছিল, তা পড়লে যেমন গায়ে কাঁটা দেয়, তেমনি উৎসাহে লাফাতে হয়। **দাম দশ আনা**